দ্য আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো

এইচ. জি. ওয়েলস

ভাষান্তর: দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



দ্য আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো

এইচ. জি. ওয়েলস

ভাষান্তর : দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৯৪
এপ্রিল ১৯৮৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
এন. এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন
কলকাতা ৭০০০১২

পনেরো টাকা

মধ্য-কলকাতায় প্রাচীন বটের মতো জীর্ণ একটা বাড়ি,
স্যাঁতসেঁতে ঘরের পলেস্তারা-খসা দেয়ালে নদী-পাহাড়-
সমুদ্র কিংবা উট-তিমি-পেঙ্গুইনের বিমূর্ত আদল,
মুঠো মুঠো স্বপ্ন, আর অর্বাচীন এক কিশোর… …

মুখবন্ধ

১৮৮৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ১° দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ১০৭° পশ্চিম দ্রাঘিমা অঞ্চলে একটা পরিত্যক্ত জাহাজের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে 'লেডি ভেইন' সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

আমার কাকা এডওয়ার্ড প্রেনডিক ক্যালাও বন্দর থেকে লেডি ভেইনে চেপেছিলেন। ধরে নেওয়া হয়েছিলো জাহাজ ডুবির ফলে তিনিও সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। কিন্তু ১৮৮৮ সালের ৫ই জানুয়ারী, অর্থাৎ ওই ঘটনার এগারো মাস চার দিন বাদে, ৫°৩ দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ১০১° পশ্চিম দ্রাঘিমায় একটা ছোট্ট খোলা নৌকো থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। নৌকোর নামটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে অনুমান করে নেওয়া হয়, ওটা হারিয়ে-যাওয়া জাহাজ ইপিকাকুয়ানহার জীবন-তরী। উদ্ধার পাবার পরে কাকা নিজের সম্পর্কে যে অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছিলেন তাতে ধরেই নেওয়া হয়েছিলো যে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। পরবর্তী কালে তিনি নিজেও বলেছিলেন যে লেডি ভেইন ছেড়ে যাওয়ার পরের মুহূর্ত থেকে তাঁর আর কিছুই মনে নেই। শারীরিক এবং মানসিক পীড়নের ফল স্বরূপ স্মৃতিভ্রংশের এক বিচিত্র উদাহরণ হিসেবে কাকার ঘটনাটা তৎকালীন মনস্তত্ত্ববিদদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিলো। কাকার উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর বিভিন্ন কাগজ-পত্রের মধ্যে তাঁর এই বিবরণীটাও আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু কাহিনীটা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার কোনো নির্দিষ্ট অনুরোধ সেখানে ছিলো না।

কাকাকে সমুদ্রের যে অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয় সেখানে নোবলস্ দ্বীপ নামে জনবসতিবিহীন একটা ছোট্ট আগ্নেয় দ্বীপ ছাড়া অন্য কোনো ভূখণ্ডের অস্তিত্ব জানা যায়নি। ১৮৯১ সালে এইচ. এম. এস. স্করপিয়ন নামে একটা জাহাজ ওই দ্বীপে গিয়েছিলো। একদল নাবিক সেখানে নেমে এক ধরনের অদ্ভুত সাদা সাদা মথ, কয়েকটা শুয়োর, খরগোশ এবং বিচিত্র ধরনের কিছু ইঁদুর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। ওই জীবিত প্রাণীগুলোর কোনো নমুনাও তারা সংগ্রহ

করতে পারেনি। কাজেই যদিও কাকার কাহিনীর সব চাইতে প্রয়োজনীয় অংশটুকুই অপ্রমাণিত রয়ে গেছে, তবু আমার বিশ্বাস জনসাধারণের কাছে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত প্রকাশ করাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কাহিনীটার স্বপক্ষে অন্তত এটুকু বলা যেতে পারে যে, আমার কাকা ৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ১০৩° পশ্চিম *দ্রাঘিমা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন এবং দীর্ঘ এগারো মাস বাদে সমুদ্রের ওই অঞ্চলেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো। মাঝখানের এই সময়টা তিনি নিশ্চয়ই* কোনো না কোনো উপায়ে বেঁচে ছিলেন। তাছাড়া মাতাল ক্যাপটেন জন ডেভিস সহ ইপিকাকুয়ানহা নামে যে জাহাজটি একটা পুমা ও অন্যান্য কিছু জীবজন্তু নিয়ে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আফ্রিকা থেকে রওনা হয়েছিলো, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কয়েকটি বন্দরেই সে জাহাজটি সুপরিচিত ছিলো। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'বানিয়া' থেকে যাত্রা শুরু করে (বেশ কিছু পরিমাণে নারকেলের শুকনো শাঁস সহ) জাহাজটা সমুদ্রের ওই অঞ্চল থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় এবং আমার কাকার কাহিনীর সঙ্গেও ওই তারিখটার সম্পূর্ণ মিল আছে।

—চার্লস এডওয়ার্ড প্রেনডিক

লেডি ভেইনের ডিঙিতে

লেডি ভেইন জাহাজডুবি সম্পর্কে এ যাবৎ যা কিছু লেখা হয়েছে, আমি তার সঙ্গে আর নতুন কিছু যোগ করতে চাই না। সকলেই জানেন, ক্যালাও থেকে রওনা হবার দশদিন পরে একটা পরিত্যক্ত জাহাজের সঙ্গে লেডি ভেইনের সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনার আঠারো দিন পরে কামানবাহী জাহাজ এইচ. এম. মার্টাল বড়ো জীবন-তরীটা থেকে সাতজন নাবিককে উদ্ধার করে এবং তাদের কাহিনী এখন প্রায় মেডুসার কাহিনীর মতোই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি লেডি ভেইন সম্পর্কে এখন যে কাহিনীটা বলতে চলেছি, তা ওদের ওই বৃত্তান্তের চাইতেও ভয়ঙ্কর এবং অনেক বেশি আশ্চর্যজনক। এ যাবৎ ধরে নেওয়া হয়েছিলো, লেডি ভেইনের ছোটো ডিঙিটাতে যে চারজন আশ্রয় নিয়েছিলো তারা প্রত্যেকেই ডুবে গেছে। কিন্তু এ ধারণাটা সঠিক নয়—এ বিষয়ে আমি নিজেই সব চাইতে বড়ো প্রমাণ, কারণ আমি ওই ডিঙিতেই ছিলাম।

তবে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, ডিঙিতে আদপেই চারজন লোক ছিলো না—ছিলো তিনজন। কন্সট্যান্স নামে যে ব্যক্তিটিকে জাহাজের ক্যাপটেন 'ডিঙিটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিলেন', (ডেইলি নিউজ—১৭ই মার্চ, ১৮৮৭) আমাদের সৌভাগ্য এবং তার নিজের দুর্ভাগ্যক্রমে সে ডিঙিতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয়নি। ঝাঁপিয়ে পড়ার পর দড়িদড়ায় পা জড়িয়ে সে এক মুহূর্ত মাথাটা নিচের দিকে করে ঝুলে থেকে, জলে ভাসমান কোনো কাঠের টুকরো বা অন্য কিছুতে আছড়ে পড়ে। আমরা ডিঙি চালিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আর ভেসে ওঠেনি।

আগেই বলেছি, আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই লোকটা ডিঙিতে এসে পৌঁছোয়নি। তবে সৌভাগ্যটা তার নিজেরও বটে। কারণ বিপদ সঙ্কেতটা এতো আচমকা এসেছিলো, বিপদ-বিঘ্নের জন্যে জাহাজটা এতোই অপ্রস্তুত ছিলো যে ছোট্ট ডিঙিটাতে আমাদের সঙ্গে সামান্য এক কুঁজো জল আর গোটা কতক ভেজা বিস্কুট ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। বড়ো নৌকোটাতে রসদপত্র বেশি আছে ভেবে আমরা চিৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সম্ভবত ওরা আমাদের ডাক শুনতে পায়নি। পরদিন দুপুর গড়িয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে আকাশ যখন পরিষ্কার হলো, তখন আমরা আর ওদের কোনো চিহ্নই দেখতে পেলাম না। ডিঙিটা ভীষণ দুলছিলো বলে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে ভালো করে লক্ষ্যও করতে পারছিলাম না। সমুদ্রে তখন প্রচণ্ড ঢেউ, ডিঙি সামলাবার জন্যে আমরা তিনজনই ব্যতিব্যস্ত। আমি বাদে ডিঙিতে অন্য যে দুজন ছিলো তাদের মধ্যে একজনের নাম হেলমার, সে আমার মতোই একজন সাধারণ যাত্রী। অন্যজন বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ চেহারার এক নাবিক, তার নামটা আমার জানা নেই।

উপোসী অবস্থায় আমরা ভেসে চললাম। জল শেষ হয়ে যাবার পর মোট আটটা দিন কেটে গেলো অসহ্য তৃষ্ণায়। দ্বিতীয় দিনের পরেই সমুদ্রটা আস্তে আস্তে কাচের মতো শান্ত হয়ে উঠেছিলো। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই আটটা দিনের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। প্রথম দিনটা কেটে যাবার পর থেকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সামান্যই কথাবার্তা বলতাম, ডিঙিতে যে যার জায়গায় শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে থাকতাম দিগন্তের দিকে—অথবা ক্রমশ বিস্ফারিত এবং নিষ্প্রভ হয়ে ওঠা চোখ দুটো মেলে লক্ষ্য করতাম, দুর্দশা আর দুর্বলতা কিভাবে অন্য সঙ্গীদের একটু একটু করে দখল করে ফেলছে। ক্রমে আকাশের সূর্যটা অকরুণ হয়ে উঠলো।

চতুর্থ দিনেই আমাদের জলটুকু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমরা তখন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ভাবতে শুরু করেছি, চোখ দিয়ে বলতে শুরু করেছি মনের ভাবনাগুলোকে। যে কথাটা আমাদের প্রত্যেকের মনেই জেগে উঠেছিলো, অবশেষে ষষ্ঠ দিনে হেলমারই তা ভাষায় প্রকাশ করলো। মনে আছে আমাদের কণ্ঠস্বরগুলো তখন শুকনো আর ক্ষীণ হয়ে উঠেছে, পরস্পরের দিকে ঝুঁকে কোনো রকমে আমরা ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা চালালাম। সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি প্রস্তাবটাতে আপত্তি জানালাম। বললাম, তার চাইতে বরং ডিঙিটাকে উলটে দিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে থাকা হাঙরগুলোর কাছে নিজেদের বিলিয়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু হেলমার যখন বললো যে তার প্রস্তাব মেনে নিলে আমাদের পানীয় জুটবে, তখন নাবিকটাও তার কথায় সায় জানালো।

আমি ভাগ্য পরীক্ষায় রাজী হলাম না। রাত্রিবেলা নাবিকটা মাঝেমাঝেই হেলমারকে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলছিলো। আমি ছোট্ট ছুরিটা হাতে নিয়ে নৌকোর সামনের দিকটাতে বসে রইলাম—যদিও আমার সন্দেহ হয়, লড়াই করার মতো শক্তি তখন আমার আদৌ ছিলো কিনা!

পরদিন সকালে আমিও হেলমারের প্রস্তাবে রাজী হলাম। নির্দিষ্ট মানুষটাকে বেছে নেবার জন্যে আধ পেন্সের একটা মুদ্রা ছোঁড়া হলো। নাম উঠলো নাবিকের। কিন্তু সে ছিলো আমাদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিমান। তাই সে এতে রাজী না হয়ে দু হাত বাড়িয়ে হেলমারকে আক্রমণ করলো। দুজনে জাপটাজাপটি করে প্রায় উঠে দাঁড়ালো। হেলমারকে সাহায্য করার জন্যে আমি তখন গুঁড়ি মেরে এগুতে লাগলাম, ভাবলাম নাবিকটার পাটা চেপে ধরবো। কিন্তু সেই মুহূর্তে ডিঙিটা দুলে উঠতেই নাবিকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো এবং ওরা দুজনেই ডিঙি থেকে গড়িয়ে জলে পড়ে পাথরের মতো টুপ করে ডুবে গেলো। মনে আছে, দৃশ্যটা দেখে আমি হেসে উঠেছিলাম—অথচ ভেবে পাচ্ছিলাম না, কেন হাসলাম। অকারণে আর আচমকাই এসে গিয়েছিলো হাসিটা।

তারপর একা আমি ডিঙিতে পড়ে রইলাম—জানি না কতোক্ষণ। শুধু ভাবছিলাম, শক্তি থাকলে হয়তো তাড়াতাড়ি মরার জন্যে সমুদ্রের জল খেয়েই পাগল হয়ে যেতাম। শুয়ে থাকতে থাকতেই একটা ছবির দেখার মতো অনাগ্রহী চোখ মেলে দেখতে পেলাম, দিগন্ত-রেখার কাছ থেকে একটা পাল আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমার চিন্তাধারা তখন নিশ্চয়ই অসংলগ্ন ছিলো, অথচ তখন যা

কিছু ঘটেছিলো তা সবই আমার স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে সমুদ্রের দোলায় তখন আমার মাথা ঘুরছিলো আর দিগন্তের কোলে নেচে নেচে জেগে উঠছিলো সেই পালটা। স্পষ্ট মনে আছে আমি তখন নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম, আমি মরে গেছি—নৌকোটা বড্ড দেরি করে এলো, এলো শুধু আমার দেহটাকে উদ্ধার করতে—সত্যি, এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস!

মনে হচ্ছিলো আমি যেন অনন্তকাল ধরে শুয়ে শুয়ে জাহাজটার নাচন লক্ষ্য করছি। অথচ ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কোনো চেষ্টা করার কথা তখন আমার মাথায় আসেনি। তারপরের কথাগুলো আর স্পষ্ট করে মনে নেই। আমার জ্ঞান ফিরেছিলো জাহাজের পেছন দিককার ছোট্ট একটা কেবিনে। আবছা আবছা শুধু মনে পড়ে, আমাকে যখন ধরাধরি করে জাহাজে তোলা হচ্ছিলো তখন লাল চুল আর মেচেতার দাগে ভর্তি একটা লাল মুখ ওপরের বেষ্টনী থেকে তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে। ছেঁড়া-ছেঁড়া অসংলগ্ন ভাবে আরও মনে পড়ে, আমার মুখের খুব কাছাকছি অ-স্বাভাবিক চোখ সহ একটা কালো মুখও আমি দেখতে পেয়েছিলাম। ফের ওই মুখটা না দেখা অব্দি আমি ভেবেই নিয়েছিলাম, ওটা একটা দুঃস্বপ্ন। সম্ভবত কোনো জলীয় পদার্থ আমার মুখে ঢেলে দেওয়া হয়েছিলো। তারপর আর কিছুই জানি না।

অজানার উজানে

জ্ঞান ফিরতে দেখি, আমি ছোট্ট একটা অগোছালো কেবিনে শুয়ে রয়েছি। একটা লোক আমার নাড়ি পরীক্ষা করছে—তার মাথায় বাদামি রঙের হালকা চুল, খোঁচা খোঁচা কটা গোঁফ, নিচের ঠোঁটটা ভীষণ পুরু। মিনিট খানেক আমরা কেউই কোনো কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটার চোখ দুটো কেমন যেন ছলছলে, ধূসর আর অভিব্যক্তিহীন।

ঠিক তখুনি ওপর দিক থেকে যেন লোহার খাট ঠেলে ফেলার মতো একটা শব্দ শোনা গেলো, আর সেই সঙ্গে কোনো বড়সড়ো জন্তুর চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

সম্ভবত বলেছিলাম, ভালোই আছি। কি করে এখানে এলাম, তা আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। আমার কণ্ঠস্বর আমি নিজেই শুনতে

পাইনি, কিন্তু প্রশ্নটা বোধহয় আমার মুখেই ফুটে উঠেছিলো। কারণ ভদ্রলোক নিজে থেকেই বললেন, 'না খেয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় আপনি একটা ডিঙিতে ভাসছিলেন। সেখান থেকে আপনাকে উদ্ধার করে জাহাজে তুলে নেওয়া হয়। ডিঙিটার গায়ে নাম লেখা ছিলো, 'লেডি ভেইন'—আর ডিঙিটাতে রক্তের দাগ ছিলো।'

সেই মুহূর্তে নিজের হাতের দিকে আমার নজর পড়লো। কি রোগা…মনে হয় যেন আলগা হাড়-ভর্তি একটা নোংরা চামড়ার থলে। সঙ্গে সঙ্গে ডিঙির সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়ে গেলো।

'এটুকু খেয়ে নিন,' টকটকে লাল আর বরফের মতো ঠাণ্ডা কি একটা জিনিস এক দাগ মতো উনি আমাকে খেতে দিলেন। জিনিসটার স্বাদ রক্তের মতো, সেটা খেয়ে যেন একটু বল পেলাম।

ভদ্রলোক ফের বললেন, 'আপনার ভাগ্য ভালো—যে জাহাজ আপনাকে উদ্ধার করে ডিঙি থেকে তুলে নিয়েছে, সেখানে একজন ডাক্তারও রয়েছে।'

ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি জাহাজ?' বহুক্ষণ চুপ করে ছিলাম বলে কণ্ঠস্বরটা কর্কশ শোনালো।

'এটা ছোট্ট একটা বাণিজ্য জাহাজ—আফ্রিকা আর ক্যালাও হয়ে আসছে। তবে কোত্থেকে যাত্রা শুরু করেছিলো, তা আমি জিজ্ঞেস করিনি—সম্ভবত জন্ম-নির্বোধদের দেশ থেকে। আমি নিজে একজন যাত্রী, আফ্রিকা থেকে উঠেছি। একটা গর্দভ এ জাহাজের মালিক। সে নিজেই এর ক্যাপটেন। নাম, ডেভিস। লোকটা বোধহয় নিজের সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে—এদিকে আবার জাহাজের নাম রেখেছে, ইপিকাকুয়ানহা!'

ওপর থেকে ফের সেই শব্দটা ভেসে এলো—কোনো জন্তুর চাপা গর্জন আর সেই সঙ্গে কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর। তারপর অন্য একজন 'কোনো এক হতচ্ছাড়া'কে চুপ করতে বললো।

'আপনি তো প্রায় মরেই গিয়েছিলেন!' ভদ্রলোক বললেন, 'প্রায় হয়ে এসেছিলো, আর কি! তবে আমি আপনাকে ওষুধ দিয়েছি। আপনার হাত দুটোতে ব্যথা হয়েছে না? ইনজেকশন। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা আপনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন।'

একটু একটু করে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। কিন্তু কতকগুলো কুকুরের চিৎকারে আমার মনোযোগ ছিন্ন হয়ে গেলো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি শক্ত খাবার খেতে পারি ?'

'হ্যাঁ, এ জন্যে আমার কিন্তু ধন্যবাদ পাওয়া উচিত !' ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার জন্যে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে একটু-আধটু মাংস বোধহয় খেতে পারবো।'

'কিন্তু, ইয়ে…' এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করে উনি বললেন, 'ওই ডিঙিটাতে আপনি একা হলেন কি করে, তা না শুনে আমি আর থাকতে পারছি নে !'

মনে হলো ভদ্রলোকের দু চোখে যেন একটু সন্দেহ ফুটে উঠলো। তারপরেই উনি 'ওঃ, অসহ্য এই চিৎকার !' বলে হঠাৎ কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কার সঙ্গে যেন প্রচণ্ড তর্ক করতে শুরু করলেন। শব্দ শুনে মনে হলো বুঝি ঘুঁষো-ঘুঁষিতেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু ভাবলাম, হয়তো আমি ভুল শুনেছি। তারপরেই উনি চিৎকার করে কুকুরগুলোকে ধমক দিয়ে, কেবিনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন ? আপনি সবেমাত্র আমাকে বলতে শুরু করে-ছিলেন।' বললেন উনি।

আমি ওঁকে জানালাম, আমার নাম এডওয়ার্ড প্রেনডিক। আরও জানালাম সচ্ছল-স্বাধীন জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে কিভাবে আমি প্রাণীতত্ত্বের চর্চায় স্বস্তি খুঁজে পেয়েছি। মনে হলো কথাটা শুনে উনি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। বললেন, 'আমি নিজেও খানিকটা বিজ্ঞানচর্চা করেছি। ইউনি-ভারসিটি কলেজে জীবতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করেছি। কেঁচোর ডিম্বাশয়, শামুকের র‍্যাডুলা ইত্যাদি ইত্যাদি কেটেকুটে বের করতাম। ওঃ, সে আজ দশ বছর আগেকার কথা ! কিন্তু ওসব কথা থাক—আপনি বরং ওই ডিঙির ঘটনাটা আমাকে বলুন।'

প্রচণ্ড দুর্বলতা অনুভব করছিলাম বলে আমি যথেষ্ট সংক্ষেপেই আমার কাহিনীটা ওঁকে শোনালাম। ঘটনাটার খোলাখুলি বর্ণনা ওঁকে স্পষ্টতই খুশি করেছে বলে মনে হলো। কিন্তু আমার কাহিনী শেষ হতেই উনি ফের প্রাণীতত্ত্ব এবং জীববিজ্ঞানের প্রসঙ্গ তুললেন। টটেনহ্যাম কোর্ট রোড এবং গাওয়ার স্ট্রীট সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন আমাকে। কথাবার্তায় স্পষ্টই বোঝা গেলো ভদ্রলোক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন অতি সাধারণ ছাত্র ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে উনি এলোমেলোভাবে মিউজিক হলের কথাটা তুলে, কয়েকটা ঘটনাও আমাকে শোনালেন। তারপর বললেন, 'দশ বছর আগে সব

কিছুই ছেড়ে এসেছি। আহা, কি ভালোই না ছিলো সেই দিনগুলো! অথচ একুশ বছর বয়েস হওয়ার আগেই আমি একটা নিরেট গর্দভের মতো সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে দিলাম। এখন তো জীবনটাই একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে।…নাঃ যাই, দেখি হতচ্ছাড়া আহাম্মুক রাঁধুনেটা আপনার মাংসটায় কি গতি করলো।'

হঠাৎ মাথার ওপরে নতুন করে সেই ক্রুদ্ধ গর্জন শুরু হতেই ব্যাপারটার আকস্মিকতায় আমি একেবারে চমকে উঠলাম।

'ওটা কিসের গর্জন?' আমি ভদ্রলোকের পেছন দিক থেকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তার আগেই উনি কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে দিয়েছেন। একটু বাদেই উনি সিদ্ধ-মাংস নিয়ে ফিরে এলেন এবং মাংসের ক্ষুধা-বৃদ্ধিকারী গন্ধে আমি এতোই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম যে সেই জান্তব চিৎকারের কথাও আমার আর মনে রইলো না।

একটা দিন ক্রমাগত খেয়ে আর ঘুমিয়ে আমি বাঙ্ক থেকে নেমে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখার মতো সুস্থ হয়ে উঠলাম। দেখছিলাম সবুজ সমুদ্রটা কিভাবে আমাদের জাহাজের গতির সঙ্গে তাল রাখতে চেষ্টা করছে। এমন সময় মণ্টগোমেরি—মানে বাদামি চুলওলা সেই ভদ্রলোক—কেবিনে এসে ঢুকলেন। আমি ওঁর কাছে কয়েকটা পোশাক-আশাক চাইলাম। উনি বললেন ডিঙিতে আমার পরনে যে পোশাক ছিলো, সেগুলো সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। উনি নিজের ব্যবহারের কয়েকটা পোশাক আমাকে দিলেন। ওঁর চেহারাটা বড়সড়ো বলে সেগুলো আমার গায়ে একটু ঢিলেঢালা হলো।

কথা প্রসঙ্গে মণ্টগোমেরি আমাকে জানালেন, জাহাজের ক্যাপটেন প্রায় সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে নিজের কেবিনে পড়ে রয়েছে। ওঁর দেওয়া পোশাক পরতে পরতে আমি জাহাজের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে ওঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। উনি বললেন, জাহাজটা হাওয়াইতে যাচ্ছে তবে পথে ওঁকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?'

উনি বললেন, 'একটা দ্বীপে…আমি সেখানে থাকি। যতোদূর জানি দ্বীপটার কোনো নাম নেই।'

নিচের ঠোঁটটা ঝুলিয়ে দিয়ে উনি আচমকা এমন বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে মনে হলো, উনি আমার প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যেতে চান। তাই আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করবো না বলে স্থির করলাম।

অদ্ভুত মুখ

কেবিন থেকে বেরুতেই দেখি, একটা লোক আমাদের পথ জুড়ে রেখেছে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে লোকটা। দেখেই বুঝলাম, লোকটার কেমন যেন বিকলাঙ্গ চেহারা—বেঁটে, মোটা, কুঁজো, ঘাড়ে-গর্দানে, ঘাড় ভর্তি লোম, মাথার চুলগুলো অদ্ভুত রকমের কর্কশ আর কালো। লোকটার পরনে গাঢ় নীল সার্জের পোশাক। হঠাৎ আমাদের চোখের আড়ালে থাকা সেই কুকুরগুলো ফের হিংস্রভাবে গর্জন করে উঠতেই লোকটা চট করে পেছিয়ে এসে আমার হাতের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। সঙ্গে সঙ্গে জান্তব দ্রুততায় ফিরে তাকালো সে।

কেন জানি না, লোকটার কালো মুখখানা আচমকা আমাকে ভীষণ চমকে দিলো। মুখটা সত্যিই বিকৃত। সরু, লম্বাটে, অনেকটা পশুর মতো মুখ। বিশাল আধ-খোলা মুখের ভেতরে বড়ো বড়ো সাদা দাঁত—কোনো মানুষের অতো বড়ো দাঁত আমি আজ অব্দি দেখিনি। চোখের মণি দুটো হালকা বাদামি রঙের, তাকে ঘিরে সামান্য একটু সাদা অংশ। ধারগুলোতে লালচে ছটা। সারা মুখে উত্তেজনার এক অদ্ভুত আভাস।

'কি জ্বালা!' মন্টগোমেরি বললেন, 'পথ ছাড়ছো না কেন?'

কালো-মুখো লোকটা কিছু না বলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে আমি সহজাত প্রবৃত্তিবশেই একবার লোকটার দিকে ফিরে তাকালাম। মন্টগোমেরি মুহূর্তকাল সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ওকে বললেন, 'এদিকে তো তোমার কোনো কাজ নেই। তোমার জায়গা সামনের দিকে।'

কালো-মুখ লোকটা যেন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে, অদ্ভুত কর্কশ গলায় বললো, 'ওরা…ওরা আমাকে সামনের দিকে থাকতে দেবে না।'

'থাকতে দেবে না!' মন্টগোমেরি হিংস্র স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমি তোমাকে সেখানেই যেতে বলছি।'

উনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। তারপর আমার পেছন পেছন উঠে আসতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির মাঝবরাবর উঠে, আমি থমকে দাঁড়িয়ে ফের একবার পেছনের দিকে তাকালাম,

কালো-মুখো মানুষটার বিশ্রী কদাকার চেহারা তখনও আমাকে বিস্ময়ে একেবারে আবিষ্ট করে রেখেছে। অমন বীভৎস অস্বাভাবিক মুখ আমি জীবনেও দেখিনি। অথচ অবিশ্বাস্য হলেও আমার কেমন যেন মনে হলো, আমাকে অবাক করে তোলা ওই চেহারা আর ওই অঙ্গভঙ্গি আমার পূর্ব-পরিচিত। পরে মনে হয়েছিলো, আমাকে জাহাজে তুলে নেবার সময় হয়তো আমি ওকে দেখে থাকবো। কিন্তু তাতেও ওর সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয়ের সন্দেহটা ঠিকমতো দূর হয়নি। অথচ একবার এমন অদ্ভুত একটা মুখ দেখেও আমি যে কি করে সেই বিশেষ ঘটনাটার কথা ভুলে গেলাম, তাও জানি না।

মণ্টগোমেরি আমার পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন বলে আমি মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে স্কুনারের ডেকটার দিকে তাকালাম। আগেই কুকুরের চিৎকার শুনেছি বলে আমি যা দেখলাম তার জন্যে ইতিমধ্যেই অর্ধেক প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলাম। সত্যি, এতো নোংরা ডেক আমি কোনোদিনও দেখিনি। চারদিকে গাজরের টুকরো, কাঁচা আনাজের ছাঁট আর হরেক রকম আবর্জনার জঞ্জাল। বড়ো মাস্তুলটার সঙ্গে শেকলে বাঁধা একদল রোমশ স্ট্যাগ হাউণ্ড আমাকে দেখেই লাফালাফি আর চিৎকার জুড়ে দিলো। পেছনের মাস্তুলটার কাছে ছোট্ট একটা লোহার খাঁচায় একটা বিশাল পুমা জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে—বেচারার একটুও নড়াচড়া করার জায়গা নেই। জাহাজের ডান দিকে কতকগুলো বিশাল খাঁচায় একগাদা খরগোশ। আরও সামনে বাক্সের মতো একটা খাঁচায় একটা লামাকে যেন ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। কুকুরগুলোর মুখে চামড়ার থলে বাঁধা। ডেকের ওপরে একমাত্র মানুষ হলো, জাহাজের চালক-চাকার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা একজন গাট্টাগোট্টা নাবিক।

জাহাজের তাপ্পি-মারা নোংরা পালগুলো তখন বাতাসে টান-টান হয়ে রয়েছে। মনে হলো জাহাজের সবকটা পালই বোধহয় তুলে দেওয়া হয়েছে। আকাশ পরিষ্কার, সূর্য পশ্চিম আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় নেমে গেছে। সারঙকে পেরিয়ে আমরা জাহাজের পেছন দিকে চলে গেলাম। তাকিয়ে দেখি, নিচে সফেন সমুদ্র —বুদবুদগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে কোথায়। মুখ ঘুরিয়ে দুর্গন্ধে ভরা জাহাজটার আগাপাস্তলা একবার চোখ দিয়ে জরিপ করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি একটা সামুদ্রিক পশু সংগ্রহশালা নাকি ?'

'দেখে তা-ই মনে হয়,' জবাব দিলেন মণ্টগোমেরি।

'ওই জন্তুগুলো এখানে রয়েছে কেন? বিক্কিরির জন্যে, নাকি স্রেফ সংগ্রহ করে রাখার জন্যে? ক্যাপটেন কি ভেবেছেন, ওগুলোকে উনি দক্ষিণ সমুদ্রে কোথাও বিক্রি করে দেবেন?'

'দেখে শুনে তো তা-ই মনে হচ্ছে, নয় কি?' জবাব দিয়ে মণ্টগোমেরি ফের জলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

হঠাৎ আমরা সিঁড়ির দিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আর একরাশ হিংস্র গালাগাল শুনতে পেলাম এবং তারপরেই কালো-মুখো সেই বিকলাঙ্গ মানুষটা দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। পরক্ষণেই যে লোকটা তাকে তাড়া করে এলো, তার মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লাল চুল—সাদা টুপি পরা। কুকুরগুলো আমাকে দেখে চিৎকার করতে করতে এতোক্ষণে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলো। এবারে বিকলাঙ্গ ওই অদ্ভুত মানুষটাকে দেখে ফের তারা উত্তেজিত হয়ে হিংস্র চিৎকার আর শেকল টেনে লাফঝাঁপ শুরু করে দিলো। কালো মানুষটা জন্তুগুলোর কাছাকাছি এসে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলো। সেই অবসরে লাল-চুলওলা লোকটা তার কাঁধে এমন এক ধাক্কা মারলো যে সে একটা কাটা ষাঁড়ের মতো ছিটকে পড়ে জঞ্জাল-আবর্জনার ভেতর দিয়ে গড়াতে গড়াতে সেই উত্তেজিত হিংস্র কুকুরগুলোর মধ্যে গিয়ে পড়লো। লোকটার ভাগ্যি ভালো, কুকুরগুলোর মুখ বাঁধা ছিলো। ওদিকে লাল-চুলওলা লোকটা পরম উল্লাসে একটা চিৎকার করে তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। গতিক দেখে আমার মনে হলো, এখন ফের ওই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়া বা এগিয়ে গিয়ে কালো-মুখোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া—দুই-ই ওই লোকটার পক্ষে সমান বিপজ্জনক।

দ্বিতীয় লোকটাকে আসতে দেখেই মণ্টগোমেরি ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলেন। তীব্র প্রতিবাদের স্বরে উনি গর্জে উঠলেন, 'চুপ করে দাঁড়াও ওখানে!'

ততোক্ষণে বেশ কয়েকজন নাবিক ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে। কালো-মুখো মানুষটা তখন প্রাণপণে চিৎকার করছে আর কুকুরগুলোর পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। কিন্তু কেউই তাকে সাহায্য করার কোনো চেষ্টা করলো না। বদমাশ জন্তুগুলো তাকে ভয় দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, বাঁধা মুখ দিয়ে তাকে ঢু মারছে, দেহের ওপরে উঠে নাচছে—আর নাবিকগুলো চিৎকার করে তাদের উৎসাহ দিচ্ছে, যেন এটা একটা মজার খেলা। মণ্টগোমেরি এবারে ক্রুদ্ধস্বরে ধমকে উঠে লম্বা লম্বা পায়ে ডেক ধরে এগিয়ে গেলেন। আমিও অনুসরণ করলাম ওঁকে।

এক মুহূর্ত পরেই কালো-মুখো লোকটা কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে, টলতে টলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর জাহাজের বেষ্টনীতে হেলান দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো কুকুরগুলোর দিকে। তাই দেখে তৃপ্তির হাসি ছড়ালো লাল-চুলওলা লোকটা।

মণ্টগোমেরি লাল-চুলওলা লোকটার কনুই আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'ত্মাখো ক্যাপটেন, এসব চলবে না।'

আমি মণ্টগোমেরির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ক্যাপটেন আধ পাক ঘুরে মাতালের বিষণ্ণ ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো, 'কি চলবে না, শুনি?' তারপর ঢুলুঢুলু চোখে এক মিনিট মণ্টগোমেরির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ফের বললো, 'হতচ্ছাড়া নরকের কীট!' এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, বার দুই বৃথা প্রচেষ্টার পর নিজের মুঠিবদ্ধ হাত দুটো পকেটে গুঁজে ফেললো লোকটা।

'ওই লোকটা একজন যাত্রী,' মণ্টগোমেরি বললেন, 'আমি বলছি, তুমি ওর গায়ে হাত তুলবে না।'

'তুমি জাহান্নামে যাও!' চিৎকার করে উঠলো ক্যাপটেন। তারপর চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এক ধারে যেতে যেতে বললো, 'আমার জাহাজে আমি যা খুশি তা-ই করবো।'

আমার মনে হয় মণ্টগোমেরি লোকটাকে তখন ছেড়ে দিলেই পারতেন—কারণ হতভাগা তখন বেহেড মাতাল। কিন্তু ওঁর মুখটা এক পোঁচ বেশি ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। ক্যাপটেনকে অনুসরণ করতে করতে উনি বললেন, 'শোনো ক্যাপটেন, আমার ওই লোকটার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা চলবে না। জাহাজে ওঠার পর থেকেই বেচারা ভয়ে ভয়ে রয়েছে।'

মদের নেশা একটা মিনিটের জন্যে ক্যাপটেনকে নির্বাক করিয়ে রাখলো। তারপর 'হতচ্ছাড়া নরকের কীটগুলো!'—শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট বলে মনে করলো সে।

বুঝতেই পারছিলাম, যে সমস্ত মানুষের মেজাজ একটু একটু করে গরম হতে হতে অবশেষে চরমে পৌঁছোয়, তারপর আর কিছুতেই ঠাণ্ডা হয় না—মণ্টগোমেরি তাদেরই একজন। আরও বুঝতে পারলাম, এই বিবাদটা বেশ কিছুদিন ধরেই গড়ে উঠেছে। তবু, হয়তো খানিকটা গায়ে পড়েই, ওঁকে বললাম, 'লোকটা মাতাল, ওর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই।'

'ও সব সময়েই মাতাল,' ঝুলে পড়া ঠোঁটটাতে একটা বিশ্রী মোচড় দিয়ে মণ্টগোমেরি বললেন, 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন, তাই বলে ও যে যাত্রীদের অপমান করছে—সেটা দোষের হবে না?'

'আমার জাহাজ ছিলো পরিষ্কার ঝকঝকে,' খাঁচাগুলোর দিকে এলোমেলো-ভাবে হাত নাড়তে নাড়তে ক্যাপটেন বলতে শুরু করলো। 'আর এখন এর কি হাল হয়েছে, ছাখো!'—সত্যি, জাহাজটাকে এখন কোনোমতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলা চলে না।—'যাত্রী…' ক্যাপটেন ফের বলতে থাকে, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সম্ভ্রান্ত যাত্রী!'

'কিন্তু তুমিই তো জন্তুগুলোকে নিতে রাজী হয়েছিলে।'

'তোমাদের ওই নরকের দ্বীপটা চর্মচক্ষে দেখতে না হলেই ছিলো ভালো! ওই…ওই হতচ্ছাড়া দ্বীপটাতে তোমরা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কি করো, বলো তো? তারপর তোমাদের ওই লোকটা…ধরে নিচ্ছি একসময় ও মানুষ ছিলো। কিন্তু ও তো একটা পাগল! জাহাজের পেছন দিকটাতে যাবার কি দরকার ওর? তোমরা কি মনে করো পুরো জাহাজটাই তোমাদের সম্পত্তি?'

'জাহাজে ওঠার পর থেকেই তোমার নাবিকরা ওই হতচ্ছাড়াটাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছে।'

'হতচ্ছাড়া? ঠিক তাই—হতচ্ছাড়া কেলে-কুচ্ছিত শয়তান! আমার লোকজন ওকে সহ্য করতে পারে না, আমিও পারি না—আমরা কেউই ওকে বরদাস্ত করতে পারি না…তুমিও না।'

মণ্টগোমেরি ঘুরে দাঁড়ালেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'যাই হোক, তোমরা ওকে আর বিরক্ত করবে না।'

কিন্তু ক্যাপটেনের ইচ্ছে ঝগড়াটা চালিয়ে যাবার। গলা চড়িয়ে সে বললো, 'ও যদি ফের জাহাজের ওধারে যায় তো আমি ওর পেট ফাঁসিয়ে দেবো, এই বলে রাখলাম। আমি কি করবো না করবো তা তুমি বলার কে হে? শুনে রাখো, আমি এ জাহাজের ক্যাপটেন—ক্যাপটেন এবং মালিক। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, এখানে আমিই আইন। একটা লোক আর তার চাকরকে আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে নিয়ে আসা এবং আসার সময় কয়েকটা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে আসা—এই চুক্তিতে আমি রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে এমন চুক্তি আমি কখনও করিনি যে আমাকে একটা উন্মাদ শয়তান, একটা নির্বোধ নরকের কীট, একটা…'

লোকটা মণ্টগোমেরিকে যা বললো, সে কথা থাক। কিন্তু মণ্টগোমেরিকে এক পা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, 'লোকটা মাতাল।' ক্যাপটেন তখন আগের চাইতেও বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করলো। মণ্টগোমেরির সাদা মুখটাতে দুর্যোগের আভাস লক্ষ্য করে আমি এবারে চট করে ক্যাপটেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, 'চুপ!' এবং তার ফলে নিজেকে ক্যাপটেনের আক্রোশ-বর্ষণের লক্ষ্যবস্তু করে তুললাম।

যাই হোক, মাতাল ক্যাপটেনের শত্রুতার মূল্যে হলেও একটা আসন্ন বিরোধ এড়াতে পেরেছি বলে আমার বেশ ভালো লাগছিলো। বহু খামখেয়ালি ক্ষ্যাপা মানুষ আমি দেখেছি, কিন্তু এযাবৎ কারুর মুখ থেকেই অনর্গল এমন অশ্রাব্য ভাষা শুনেছি বলে মনে হয় না। লোকটার কিছু কিছু কথাবার্তা আমার পক্ষেও বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে উঠেছিলো—যদিও আমি একজন শান্ত মেজাজের মানুষ। তবে ক্যাপটেনকে ধমকে ওঠার সময় আমি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম যে জাহাজ-ডুবির ফলে সমুদ্রের বুকে ভেসে চলা অন্যান্য সামগ্রীর মতো আমিও নিতান্ত অসহায় একটা মানুষ, আমার কোনো সঙ্গতি নেই, আমি জাহাজের ভাড়া দিইনি, এখানে আমি সম্পূর্ণ অন্যের করুণার ওপরে নির্ভরশীল। ক্যাপটেন যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই কথাগুলো আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু আর যাই হোক, একটা লড়াই তো আমি আটকে দিয়েছি!

জাহাজের রেলিঙে

সেদিন সূর্যাস্তের পরেই তীর দেখা গিয়েছিলো। রাত্রিবেলা আমাদের জাহাজ নোঙর ফেললো। মণ্টগোমেরি জানিয়ে দিয়েছিলেন, এটাই তাঁর গন্তব্যস্থল। তীর অনেকটা দূরে বলে তখনও কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিলো না। শুধু মনে হচ্ছিলো যেন ধূসর সমুদ্রের বুকে এক চিলতে নীলের আঁচড় ছড়িয়ে রয়েছে আর ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা সেখান থেকে প্রায় লম্বভাবে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

তীর যখন দেখা যায়, তখন ক্যাপটেন ডেকে ছিলো না। আমার ওপরে রাগ ঝেড়ে সে টলতে টলতে নিচে নেমে গিয়েছিলো। শুনেছি, সে নিজের কেবিনের মেঝেতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। আসলে যেটই তখন জাহাজ

চালিয়েছে। শক্তসমর্থ চেহারার এই মৌনী বাবাটিকে আমরা এর আগেই জাহাজের চালক-চাকার কাছে দেখেছি। মনে হচ্ছিলো সেও মণ্টগোমেরিকে ঠিক ভালো চোখে ছাখে না। লোকটা আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপই করছিলো না। আমার দিক থেকে দু-একবার কথাবার্তা চালাবার অসফল প্রয়াসের পর আমরা দুজনে একটা বিশ্রী নীরবতার মধ্যেই তার সঙ্গে বসে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। স্পষ্টই মনে হলো, আমার সঙ্গী আর তাঁর জন্তু-জানোয়ারগুলোকে লোকটা মোটেই দেখতে পারে না। লক্ষ্য করলাম, মণ্টগোমেরিও ওই পশুগুলো এবং নিজের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু ভেঙে বলতে খুবই অনিচ্ছুক। তাই ওই বিষয়ে আমার কৌতূহল ক্রমশ বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও আমি ওঁকে আর পীড়াপীড়ি করিনি।

ডেকে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে সারাটা আকাশ তারায় তারায় ভরে উঠলো। জাহাজের সামনের দিকে হলদে আলোয় উদ্ভাসিত অঞ্চলটা থেকে কখনও কখনও ভেসে আসা দু-একটা আওয়াজ আর মাঝে-মধ্যে জন্তুগুলোর নড়াচড়ার শব্দ ছাড়া রাতটা একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। খাঁচার এক কোণে একরাশ অন্ধকারের মতো গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা পুমাটা জলজলে চোখ মেলে লক্ষ্য করছে আমাদের। কুকুরগুলো সম্ভবত ঘুমোচ্ছে।

মণ্টগোমেরি কয়েকটা চুরুট বের করে নিলেন। স্মৃতিচারণের বিধুর কণ্ঠে উনি লণ্ডনের কথা বললেন আমাকে, জিজ্ঞেস করলেন সেখানে কি কি পরিবর্তন হয়েছে। কথা শুনে মনে হলো লণ্ডনের জীবন ওঁর ভারি প্রিয় ছিলো, কিন্তু আচমকা সেখান থেকে ওঁকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে এবং এই বিচ্ছিন্নতা আর কিছুতেই দূর হবার নয়। লণ্ডনের নানান কথাই আমি ওঁকে বললাম। কিন্তু আমার মনে ওঁর সম্পর্কে কৌতূহল ক্রমশই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিলো। কথা বলতে বলতে পেছনের লণ্ঠনটার অস্পষ্ট আলোয় আমি ওঁর পাণ্ডুর মুখখানা লক্ষ্য করছিলাম। তারপর তাকালাম অন্ধকার সমুদ্রের দিকে, যেখানে লুকিয়ে আছে মণ্টগোমেরির ছোট্ট দ্বীপটা। মনে হলো, শুধুমাত্র আমার জীবনটাকে রক্ষা করার জন্যেই যেন অনন্ত মহাশূন্য থেকে এই ভদ্রলোক এসে হাজির হয়েছিলেন—আগামীকাল তীরে নেমে আবার উনি আমার জীবন থেকেও উধাও হয়ে যাবেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও এটা আমাকে একটু চিন্তিত করে তুলতো। কিন্তু এমন একটা অজানা-অচেনা ছোট্ট দ্বীপে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং তার অদ্ভুত মালপত্র আমার মনে নতুন করে ক্যাপটেনের প্রশ্নটাকে জাগিয়ে তুললো। জন্তুগুলোকে নিয়ে কি করতে চান উনি?

আমি প্রথম যখন জন্তুগুলোর কথা তুলি, তখন কেন উনি এমন একটা ভাব দেখিয়েছিলেন যে ওগুলো ওঁর নয়? তাছাড়া ওঁর ব্যক্তিগত পরিচারকটির উদ্ভট ভাবভঙ্গিও আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে রেখেছে। সমস্ত কিছু মিলে ভদ্রলোকের চারদিকে যেন এক রহস্যের আড়াল।

মাঝরাত নাগাদ লণ্ডনের আলোচনা শেষ হলো। জাহাজের বেষ্টনীতে হেলান দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত নিস্তব্ধ সমুদ্রের দিকে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে তাকিয়ে মগ্ন হয়ে রইলাম নিজেদের ভাবনায়। পরিবেশের গুণে কৃতজ্ঞতায় আমার মন আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলো। তাই খানিকক্ষণ বাদে বললাম, 'আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন।'

'ওটা ঘটনাচক্রের ব্যাপার,' উনি বললেন, 'স্রেফ দৈবাৎ হয়ে গেছে।'

'তবু দৈবের বাস্তব প্রতিনিধি হিসেবে আমি আপনাকেই ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

'ধন্যবাদ কাউকেই জানাবেন না। আপনার প্রয়োজন ছিলো, আমার ছিলো দরকারী জ্ঞানটুকু—তাই আমি আপনাকে ইনজেকশন দিয়েছি, পথ্য দিয়েছি। আসলে তখন আমার একঘেয়ে লাগছিলো, আমি কিছু একটা করতে চাইছিলাম। সেদিন আমার মেজাজটা যদি ভালো না থাকতো কিংবা আপনার মুখটা যদি আমার পছন্দ না হতো, তাহলে এতোক্ষণে আপনার কপালে কি ঘটতো তা বলা শক্ত।'

ওঁর জবাব শুনে আমি একটু দমে গেলাম। তবু বলতে শুরু করলাম, 'কিন্তু আর যাই হোক…'

'ভাগ্য—আমি বলছি শুনুন, ওটা স্রেফ ভাগ্যচক্রে হয়ে গেছে—' আমাকে বাধা দিয়ে উনি বললেন। 'মানুষের জীবনে প্রতিটা ঘটনাই তাই। শুধু গর্দভরাই তা বুঝতে পারে না। একজন সুখী মানুষ হিসেবে লণ্ডনের সমস্ত আনন্দ-ফুর্তি উপভোগ করার বদলে, কেন আজ আমি সভ্য জগৎ থেকে পতিত হয়ে এখানে রয়েছি—জানেন? কারণ শুধুমাত্র এই যে, এগারো বছর আগে এক কুয়াশাভরা রাতে মোটে দশটি মিনিটের জন্যে আমার মতিভ্রম হয়েছিলো।'

উনি চুপ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কিছু নেই।'

ফের আমরা নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। কিন্তু একটু বাদেই মণ্টগোমেরি হেসে উঠলেন, 'এই তারার আলোয় এমন কিছু আছে যা মানুষের মুখ খুলিয়ে দেয়।

আমি একটি নির্বোধ—কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, আপানাকে আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে।'

'আপনি আমাকে যা বলবেন, তা বিশ্বাস রেখেই বলতে পারেন —আমি তা কাউকে বলবো না। মানে আপনার যদি তেমন কোনো আশঙ্কা থাকে…'

উনি যেন কি বলতে গিয়েও দ্বিধাগ্রস্তভাবে মাথা নাড়লেন।

বললাম, 'থাক, বলবেন না। আপনার বলা বা না বলা দুই-ই আমার পক্ষে সমান। তা ছাড়া নিজের গোপন কথা নিজের মনে রাখাই ভালো। আমি যদি আপনার আস্থার ওপরে শ্রদ্ধাবান হই, তাহলে আমাকে কথাটা বলে আপনি হয়তো একটু স্বস্তি পাবেন—তার চাইতে বেশি কিছু নয়। কিন্তু আমি যদি আপনার বিশ্বাসটুকু রাখতে না পারি …তাহলে?'

মণ্টগোমেরি দ্বিধাগ্রস্তভাবে কি একটা বললেন। বুঝতে পারলাম, এক অসতর্ক মুহূর্তের অবকাশে আমি ওঁকে একটু মুশকিলেই ফেলে দিয়েছি। সত্যি বলতে কি, কি কারণে একটি অল্পবয়সী ডাক্তারি ছাত্রকে লণ্ডন থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিলো তা জানার জন্যে আমি মোটেই কৌতূহলী ছিলাম না। আমি তা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি, জাহাজের বেষ্টনীতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা নিশ্চুপ ছায়ামূর্তি আকাশের তারা-গুলোকে লক্ষ্য করছে। লোকটা মণ্টগোমেরির সেই অদ্ভুত পরিচারকটি। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে সে চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে, পরক্ষণেই আবার মুখ ফিরিয়ে নিলো। ব্যাপারটা আপনাদের কাছে সামান্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা একটা আকস্মিক আঘাত। আমাদের কাছে-পিঠে একমাত্র আলো বলতে তখন জাহাজের চালক-চাকার কাছে রাখা ছোট্ট লণ্ঠনটা। লোকটা এক সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যে এদিকে মুখ ঘোরাতেই লণ্ঠনের ওই অস্পষ্ট আলোয় আমি দেখলাম, তার চোখ দুটোতে যেন হালকা সবুজ আলো ঝিকিয়ে উঠলো। তখন অব্দি আমি জানতাম না যে মানুষের চোখে অন্তত লালচে রঙের আভা থাকাটা একেবারে অসম্ভব নয়। তাই ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারে অমানুষিক বলে মনে হলো। ওই ছায়াময় কালো চেহারা আর তার আগুনে চোখ দুটো আমার প্রাপ্তবয়স্ক বোধবুদ্ধিকে বিবশ করে তুললো, মুহূর্তের জন্যে শৈশবের ভুলে যাওয়া যতো আতঙ্ক এসে অধিকার করে ফেললো আমার মনটাকে। তারপর যেমনভাবে এসেছিলো, তেমনিভাবেই কেটে গেলো ঘোরটা। দেখলাম তারার আলোর পটভূমিকায় সেই কদাকার কালো মানুষটা

তখনও জাহাজের বেষ্টনীতে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর মণ্টগোমেরি আমাকে বলছেন, 'ভাবছি, এবারে গিয়ে শুয়ে পড়লে হয়—মানে আপনার গল্প করার সাধটা যদি মিটে থাকে—'

অপ্রস্তুতভাবে আমি ওর কথার জবাব দিলাম। নিচে নেমে এলাম আমরা, আমার কেবিনের দরজায় এসে উনি আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন।

সেদিন সারাটা রাত আমি আজেবাজে অনেক বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। অনেক রাতে আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ উঠেছিলো। তারই একটুকরো বিশীর্ণ ভৌতিক আলোর রেখা আমার কেবিনে ঢুকে বাংকের পাটাতনে একটা ভয়ঙ্কর আকৃতি ফুটিয়ে তুললো। তারপর স্ট্যাগ হাউণ্ডগুলো জেগে উঠে চিৎকার আর লাফালাফি করতে শুরু করে দিলো। ফলে থেকে থেকেই আমি দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম—ভোর হবার আগে অব্দি বলতে গেলে ঘুমোতেই পারলাম না।

নিরুদ্দেশের পথিক

খুব ভোরে—আমার সুস্থ হয়ে ওঠার পরে দ্বিতীয় এবং আমাকে এ জাহাজ তুলে নেবার পর সম্ভবত চতুর্থ দিন ভোরে—একরাশ কোলাহলময় স্বপ্নের মধ্যে আমার ঘুম ভাঙলো। স্বপ্ন দেখছিলাম গুলিগোলা ছুটছে, চিৎকার করছে উত্তেজিত জনতা। ঘুম ভেঙেই ওপর থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠের তর্জনগর্জন শুনতে পেলাম। চোখ রগড়ে কান পেতে রইলাম, খানিকক্ষণ ভেবেই পেলাম না আমি কোথায় রয়েছি। তারপরে খালি পায়ে দ্রুত ছুটে যাবার শব্দ শুনতে পেলাম, ভারি মতো কোনো জিনিস যেন ছুঁড়ে দেওয়া হলো, তারপর শিকলের প্রচণ্ড ঝনৎকার। জাহাজের মুখটা হঠাৎ ঘুরে যেতেই জলে ছলাৎ করে একটা শব্দ উঠলো—পরক্ষণেই ছোট্ট গোলাকার জানলাটার কাচ ফেনাময় হলদে-সবুজ স্রোতে একাকার হয়ে গেলো। এক লাফে উঠে পোশাক-আশাক পরে আমি ডেকে গিয়ে হাজির হলাম।

তখন সবেমাত্র সূর্য উঠছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই রক্তিম আকাশের পটভূমিতে ক্যাপটেনের প্রশস্ত পিঠ আর লালচুলগুলো আমার চোখে পড়লো। তারপরেই ক্যাপটেনের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখি, জাহাজের তিন নম্বর মাস্তুলের সঙ্গে খাটানো একটা কপিকলে খাঁচাসুদ্ধ, পুমাটা পাক খাচ্ছে। মনে

হলো জন্তুটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, ছোট্ট খাঁচাটার মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে বেচারী।

'নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও সবগুলোকে!' ক্যাপটেন গর্জে উঠলো, 'হতচ্ছাড়াগুলোকে নামিয়ে দিলেই আমাদের জাহাজ একেবারে সাফ হয়ে যাবে।'

ক্যাপটেন আমার পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই আমি ডেকে যাবার জন্যে ওর কাঁধে টোকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা, আমাকে ভালো করে দেখবে বলে টলতে টলতে পেছিয়ে গেলো কয়েক পা। লোকটা যে তখনও মাতাল, তা বোঝার জন্যে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না।

'কে!' নির্বোধের মতো বললো ক্যাপটেন। পরক্ষণেই তার চোখে আলোর ছটা জেগে উঠলো, 'আরে! এ যে মিস্টার ···মিস্টার···'

'প্রেনডিক,' বললাম আমি।

'চুলোয় যাক প্রেনডিক! চুপ—এইটেই তোমার নাম—মিস্টার চুপ।'

দেখলাম, পশুটার সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। কিন্তু ওর পরবর্তী পদক্ষেপটা আমি অবশ্যই আশা করিনি। একটা গ্যাংওয়ের দিকে হাত তুলে সে গর্জে উঠলো, 'ওই যে রাস্তা, মিঃ চুপ। ওই রাস্তা দিয়ে তুমি সোজা নেমে পড়ো।'

গ্যাংওয়ের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে মণ্টগোমেরি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভদ্রলোকের চেহারাটা শক্তসমর্থ, মাথায় পাকা চুল, পরনে গাঢ় নীল ফ্লানেলের পোশাক। মনে হলো উনি সবেমাত্র জাহাজে উঠেছেন। ক্যাপটেনের কথা শুনে ওঁরা দুজনেই ফিরে তাকালেন।

'কি বলতে চাইছেন আপনি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি বলছি, ওই রাস্তা দিয়ে তুমি জাহাজ থেকে নেমে যাও, হতচ্ছাড়া মিঃ চুপ—এবং এক্ষুনি! আমরা পুরো জাহাজটা সাফ করে ফেলছি। অতএব তুমিও জাহাজ থেকে নেমে পড়ো।'

আমি হতবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর মনে হলো, আমি তো ঠিক এ-রকমটাই চেয়েছিলাম। এ ধরনের একটা ঝগড়াটে লোকের সঙ্গে একমাত্র যাত্রী হিসেবে সমুদ্রযাত্রার সুযোগ হারানোটা মোটেই দুঃখের ব্যাপার নয়। মুখ ফিরিয়ে মণ্টগোমেরির দিকে তাকালাম।

'আমরা আপনাকে সঙ্গে নিতে পারছি না,' মণ্টগোমেরির সঙ্গী সংক্ষেপে জানালেন।

'নিতে পারছেন না!' আতঙ্ক আর বিস্ময়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। অমন কঠোর আর স্থিরপ্রতিজ্ঞ মুখ আমি জীবনেও দেখিনি। ক্যাপটেনের দিকে ফিরে বলতে শুরু করলাম, 'দেখুন...'

'নেমে পড়ো!' আমাকে থামিয়ে দিয়ে ক্যাপটেন বললো, 'জন্তু-জানোয়ার, মানুষখেকো আর তার চাইতে অধম জীবদের আর এ জাহাজে জায়গা হবে না। অতএব তুমিও এখান থেকে নেমে যাও, মিঃ চুপ। ওরা যদি তোমাকে সঙ্গে নিতে না পারে, তুমি ভেসে ভেসে চলে যাও। কিন্তু যেতে তোমাকে হবেই! এই হতচ্ছাড়া দ্বীপটার সম্পর্কে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর নয়।'

'কিন্তু, মণ্টগোমেরি...' আমি মিনতি করে বললাম।

মণ্টগোমেরি নিচের ঠোঁটটা কোঁচকালেন, পাশের পক্ককেশ মানুষটির দিকে ইঙ্গিত করে নিরাশায় মাথা নাড়লেন, বুঝিয়ে দিলেন আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে উনি নিতান্তই অসহায়।

আমি তখন এক বিচিত্র ত্রিমুখী সওয়াল করতে শুরু করলাম—একে একে তিনজনের কাছেই মিনতি জানালাম। প্রথমে ওই বয়স্ক ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম, যাতে উনি আমাকে তীরে নামিয়ে দেন। তারপর মণ্টগোমেরিকে। তারপর মাতাল ক্যাপটেনকে অনুনয় করে বললাম, যাতে সে আমাকে জাহাজে থাকতে দেয়। এমন কি শেষে জাহাজের নাবিকদের কাছেও আমি করুণা ভিক্ষা করলাম। মণ্টগোমেরি একটি কথাও বললেন না, শুধু মাথা নাড়লেন।

ক্যাপটেনের সেই এক কথা, 'আমি বলছি তোমাকে জাহাজ থেকে নেমে যেতে হবে।...চুলোয় যাক আইন-কানুন। এখানে আমিই রাজা।'

অবশেষে, স্বীকার করতেই হচ্ছে, প্রচণ্ড রাগে সকলকে শাসানোর সময় হঠাৎ মাঝখানে আমার কণ্ঠস্বরটা ভেঙে গেলো। ধৈর্য হারিয়ে আমি তখন জাহাজের পেছন দিকটায় চলে গেলাম, তারপর নিরাশ হয়ে তাকিয়ে রইলাম শূন্য দৃষ্টিতে।

ইতিমধ্যে নাবিকরা জাহাজ থেকে মালপত্র আর খাঁচায় বন্দী জন্তুগুলোকে নামানোর কাজটা দ্রুত সেরে ফেলছিলো। জাহাজের কাছে দাঁড়ানো দুই পালের একটা বড়োসড়ো লঞ্চের মধ্যে দড়িতে ঝোলানো মালগুলো দুলে দুলে নেমে পড়ছিলো। আড়াল ছিলো বলে লঞ্চে চেপে আসা দ্বীপবাসীদের আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। মণ্টগোমেরি বা তাঁর সঙ্গী আমাকে লক্ষ্যই করছিলেন না। জাহাজের মাল খালাস করতে থাকা চার-পাঁচজন নাবিককে সাহায্য আর নির্দেশ দিতেই তাঁরা তখন ব্যস্ত। ক্যাপটেনও সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু সাহায্য

করার বদলে সে বরং কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বেশি। আমি তখন যুগপৎ হতাশ এবং মরিয়া। ঘটনার গতি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে করতেও আমি দু-একবার নিজের এই করুণ পরিস্থিতিতে হাসির বেগ সামলাতে পারিনি। সকাল বেলার জলখাবার না খাওয়ায় আমার ক্লান্ত আর দুর্বল লাগছিলো। খিদে এবং রক্তকণিকার অভাব পুরুষ মানুষের পৌরুষত্বকে কেড়ে নেয়। আমি পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছিলাম, ক্যাপটেন আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবার জন্যে যা-ই করুক না কেন আমি তাতে বাধা দিতে পারবো না বা জোর করে মণ্টগোমেরি আর তাঁর সঙ্গীর সঙ্গেও যেতে পারবো না। তাই ভাগ্যের হাতেই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমি নির্বিকারভাবে অপেক্ষা করে রইলাম আর ওদিকে লঞ্চে মণ্টগোমেরির মাল-পত্র নামানোর কাজও এগিয়ে চললো—যেন আমার কোনো অস্তিত্বই নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের কাজ শেষ হলো আর তারপরেই শুরু হলো লড়াই। আমি দুর্বলভাবে বাধা দিলাম, আর ওরা আমাকে গ্যাংওয়ে দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে চললো। ওই পরিস্থিতিতেও আমি লক্ষ্য করলাম, লঞ্চের লোকগুলোর বাদামি মুখগুলো কেমন যেন অদ্ভুত। মালপত্রে বোঝাই লঞ্চটা তখন দ্রুত জাহাজের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সবুজ জলের ব্যবধানটা বেড়ে উঠছে ক্রমশ। আচমকা জলে ছিটকে পড়া এড়াতে আমি প্রাণপণে নিজেকে পেছনদিকে ঠেলতে শুরু করলাম। লঞ্চের লোকগুলো তাই দেখে সচিৎকারে টিটকিরি দিয়ে উঠলো। শুনতে পেলাম মণ্টগোমেরি ওদের ধমকে দিলেন। তখন ক্যাপটেন, মেট আর ওদের সাহায্যকারী একজন নাবিক আমাকে জাহাজের একেবারে লেজের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেলো। লেডি ভেইনের ডিঙিটাকে ওখানেই জাহাজের সঙ্গে কাছি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। ডিঙিটা জলে অর্ধেক ভর্তি, কোনো দাঁড় নেই, খাদ্য-পানীয়ও কিছু নেই। আমি কিছুতেই ডিঙিতে নামতে রাজি হলাম না, টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম ডেকের ওপরে। জাহাজের ওদিকটাতে কোনো সিঁড়ি ছিলো না বলে ওরা শেষ পর্যন্ত আমাকে কাছি দিয়ে বেঁধে নৌকোয় নামিয়ে, কাছিটা কেটে দিলো। একটু একটু করে আমি জাহাজটা থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। হতভম্বের মতো লক্ষ্য করলাম, জাহাজের লোকগুলো দড়িদড়া টেনে পাল খাটাতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে বাতাসের বেগে পালগুলো ফুলে ফেঁপে উঠলো, তারপর আমার দিকে পেছন ফিরে একটু একটু করে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো জাহাজটা।

জাহাজটাকে দেখার জন্যে আমি আর মুখ ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকাইনি।

যা হয়ে গেলো, তা প্রথমটাতে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না—নির্জন তৈলাক্ত সমুদ্রটার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসেছিলাম ডিঙির মাঝখানে। তারপর বুঝতে পারলাম, আমি আমার সেই ছোট্ট ডিঙিটাতেই আবার ফিরে এসেছি—কিন্তু ডিঙিটা এখন আধ-ডোবা। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি, জাহাজের বেষ্টনীতে ঝুঁকে ক্যাপটেন আমাকে বিদ্রূপ করছে। দ্বীপের দিকে তাকালাম, দেখলাম তীরের দিকে এগিয়ে চলা লঞ্চটা ছোটো হয়ে উঠছে ক্রমশ।

আচমকা ব্যাপারটার নিবিড় নিষ্ঠুরতা আমি যেন স্পষ্ট করে উপলব্ধি করলাম। দৈবক্রমে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকা ছাড়া দ্বীপে পৌঁছবার কোনো উপায় আমার নেই। খোলা নৌকোয় আগে অতোদিন একটানা ভাসার ফলে আমি তখনও দুর্বল। পেটে খিদে, শরীরও শক্তিহীন—তা নইলে হয়তো আমার মনে আরও খানিকটা সাহস থাকতো। কিন্তু আচমকা আমি সেই শিশুবেলার মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললাম, চোখের জল নেমে এলো আমার দু গাল বেয়ে। উন্মাদ হতাশায় আমি ডিঙির তলিতে জমে থাকা জলে ঘুষি ছুঁড়লাম, লাথি মারলাম ডিঙিটার গায়ে, তারপর মৃত্যু-বর চেয়ে সরবে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম ঈশ্বরের কাছে।

বিশ্রী চেহারার নৌকো যাত্রী

আমাকে সত্যি সত্যি ভেসে যেতে দেখে দ্বীপবাসীদের মনে দয়া হলো। ভীষণ শ্লথগতিতে আমি পুব দিকে ভেসে যাচ্ছিলাম, কোনাকুনিভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম দ্বীপটার দিকে। একটু বাদেই অধীর স্বস্তি পেয়ে দেখলাম, লঞ্চটা মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে ফিরে আসছে। লঞ্চটা মালপত্রে একেবারে বোঝাই। কাছাকাছি হতে দেখলাম, মণ্টগোমেরির সঙ্গী সেই পক্ককেশ চওড়া কাঁধের ভদ্রলোকটি লঞ্চের পেছন দিকে কুকুর আর কতকগুলো প্যাকিং বাক্সের সঙ্গে গাদাগাদি করে বসে রয়েছেন। উনি নড়ছিলেন না, কোনো কথাও বলছিলেন না। শুধু একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন আমাকে। কালো-মুখো সেই বিকলাঙ্গ মানুষটা লঞ্চের সামনের দিকে পুমাটার কাছে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। ওরা বাদে লঞ্চে আরও তিনটে মানুষ, তিনজনেরই কেমন যেন অদ্ভুত পশুর মতো

চেহারা—স্ট্যাগ হাউণ্ডগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে হিংস্র গর্জন করছিলো অনবরত। মণ্টগোমেরি লঞ্চটা চালাচ্ছিলেন। লঞ্চটা কাছাকাছি এনে উনি আমার নৌকোটাকে লঞ্চের পেছন দিকে গুণ দিয়ে বেঁধে নিলেন—কারণ লঞ্চে আর একতিলও ফাঁকা জায়গা ছিলো না।

ইতিমধ্যে আমি উন্মাদনার ভাবটা সামলে নিয়েছি। তাই যথেষ্ট সাহসভরেই মণ্টগোমেরির চিৎকৃত সম্ভাষণের জবাব দিলাম। ওঁকে জানালাম যে আমার ডিঙিটা জলে প্রায় ভরে উঠেছে। উনি আমাকে একটা খালি কৌটো দিলেন। গুণের দড়িটা টানটান হতেই আমি আচমকা ঝাঁকুনিতে পেছন দিকে হেলে গেলাম। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নৌকো থেকে জল সেঁচার কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলাম।

আমাকে নিয়ে ভাসার আগেই ভিঙিতে জল ছিলো—তাছাড়া নৌকোটার অবস্থা একেবারে চমৎকার। জল সেঁচে ফেলার পর ফের আমি লঞ্চের আরোহীদের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পেলাম।

দেখলাম শুভ্রকেশ ভদ্রলোক তখনও স্থিরদৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছেন। কিন্তু মনে হলো, ওঁর অভিব্যক্তিতে যেন বিহ্বলতার ছায়া। আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই উনি চোখ নামিয়ে ওঁর দুই হাঁটুর মাঝখানে বসে থাকা স্ট্যাগ-হাউণ্ডটার দিকে তাকালেন। আগেই বলেছি, ওঁর চেহারাটা দিব্যি শক্তসমর্থ—কপালটাও উন্নত, মুখখানা একটু ভারি। কিন্তু ওঁর চোখের ওপর দিককার পাতা দুটো কেমন যেন ঝুলে পড়েছে—বয়েস বাড়লে প্রায়শই যেমনটি হয়ে থাকে। পুরু ঠোঁটের প্রান্তভাগ দুটিতে দৃঢ় প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। যে সুরে উনি মণ্টগোমেরির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তা আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম না। ওঁর দিক থেকে আমার দৃষ্টি এবারে ওঁর সঙ্গী তিনজনের দিকে গিয়ে পড়লো। ওদের মুখগুলোই শুধু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ওই মুখগুলোতে এমন কিছু ছিলো—কি তা জানি না—যা দেখে ঘেন্নায় আমার শরীরের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠলো। স্থিরদৃষ্টিতে আমি ওদের দিকে তাকিয়েই রইলাম, কিন্তু কিছুতেই সেই অনুভূতিটা কাটলো না—অথচ বুঝতে পারলাম না কেন এমন হলো।

দেখে মনে হচ্ছিলো লোকগুলোর গায়ের রঙ বাদামি। কিন্তু ওদের সর্বাঙ্গ—এমন কি হাতের আঙুল আর পায়ের পাতাও—এক ধরনের নোংরা পাতলা সাদা কাপড় দিয়ে অদ্ভুতভাবে পট্টি বাঁধা। একমাত্র প্রাচ্য দেশেই মেয়েরা সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখে, কিন্তু এর আগে পুরুষ মানুষের এমন পোশাক আমি কস্মিন কালেও

দেখিনি। মাথায় আবার পাগড়িও রয়েছে—পাগড়ির নিচ থেকে ভূতুরে মুখগুলো তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে—মুখের নিচের দিককার চোয়াল ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে, চোখগুলো জ্বলজ্বলে। ওদের মাথায় লম্বা কালো চুল, প্রায় ঘোড়ার চুলের মতো। ওরা বসেছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হলো আমার দেখা যে কোনো জাতের মানুষের চাইতে ওরা বেশি লম্বা। আমি জানি, সাদা চুলওলা ভদ্রলোকটি অবশ্যই ছ ফুট লম্বা। কিন্তু বসে থাকা অবস্থায় উনি তিনজনের চাইতেই এক মাথা নিচে।

পরে জেনেছিলাম আসলে ওরা কেউই আমার চাইতে বেশি লম্বা নয়। ওদের দেহকাণ্ড অস্বাভাবিক লম্বা, কিন্তু উরু দুটো বেঁটে আর অদ্ভুত রকমের বাঁকানো। যাই হোক, লোকগুলো সত্যিই একেবারে কদাকার। ওদের পেছন থেকে, মাথার ওপর দিয়ে, উঁকি মারছিলো সেই কালো-মুখো লোকটা যার চোখ অন্ধকারে জ্বলে।

আমি নির্নিমেষ ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার চোখে চোখ পড়তেই ওরা একে একে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এক অদ্ভুত চোরা দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। মনে হলো হয়তো আমি ওদের বিরক্ত করছি। তাই মুখ ঘুরিয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসা দ্বীপটার দিকে মনোযোগ দিলাম।

দ্বীপটা নিচু, ঘন গাছ-গাছালিতে ভরা। তার মধ্যে বিশেষ করে রয়েছে এক জাতীয় পাম গাছ, যা আমার কাছে নতুন। একটা জায়গা থেকে সাদা সুতোর মতো বাষ্পের রেখা অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে খসে-পড়া পালকের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে আমরা একটা বিশাল উপসাগরের আওতার মধ্যে এসে পৌঁছেছি, যার দু ধারে নিচু পাথুরে অন্তরীপ। সৈকতে হালকা ধূসর রঙের বালি। তারপরেই দুরন্ত চড়াই। জায়গাটা সম্ভবত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ষাট-সত্তর ফুট উঁচু। এখানে-সেখানে ইতস্তত ছড়ানো-ছেটানো কিছু গাছপালা আর ঝোপঝাড়। ওপরের দিকে মাঝামাঝি জায়গায় নানা রঙের পাথরে-ঘেরা একটা চত্বর, চত্বরের ভেতরে পাতার ছাউনি দেওয়া দুটো ঘর। পরে জেনেছিলাম, ওই পাথুরে পাঁচিলের কিছুটা প্রবাল আর কিছুটা আগ্নেয়গিরির লাভা দিয়ে গড়া।

জলের কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। বেশ খানিকটা দূর থেকে মনে হয়েছিলো, ওপরের ঝোপঝাড়গুলোর ভেতরে কিছু অদ্ভুত চেহারার প্রাণী ছোটাছুটি করছে। কিন্তু কাছাকাছি হতে তাদের আর দেখতে পেলাম না। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার আকৃতি মাঝারি,

দেখতে কালো, নিগ্রোদের মতো, বিশাল মুখটাতে ঠোঁট প্রায় নেই বললেই চলে, হাত দুটো অস্বাভাবিক সরু আর লম্বা, পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা। ভারি মুখটা সামনের দিকে বাড়িয়ে লোকটা লক্ষ্য করছিলো আমাদের। মণ্টগোমেরি আর তাঁর সঙ্গী ওই সাদা চুলওলা ভদ্রলোকটির মতো এরও পরনে নীল সার্জের জ্যাকেট আর পাতলুন। আমরা আরও কাছাকাছি হতেই লোকটা অদ্ভুত ভঙ্গিমায় সৈকতের এধার থেকে ওধারে বারবার ছোটাছুটি করতে শুরু করলো। ওদিকে মণ্টগোমেরির নির্দেশ পাওয়ামাত্র লঞ্চের লোক চারজনও তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। মণ্টগোমেরি সৈকত খুঁড়ে তৈরি করে নেওয়া ছোট্ট একটা সঙ্কীর্ণ ডকে লঞ্চটা ঢুকিয়ে দিলেন। যদিও 'ডক' বললাম, কিন্তু আসলে ওটা স্রেফ একটা নালা যার ভেতরে জোয়ারের এই পর্যায়ে লঞ্চটা কোনোক্রমে ঢুকতে পেরেছে।

তীরের লোকটা এবারে তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। সারা শরীরে পট্টি বাঁধা লোক তিনটেও কষ্টেসৃষ্টে লঞ্চ থেকে সৈকতে নেমে তীরের লোকটার সাহায্যে মালপত্র নামাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলো। বিশেষ করে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ওই তিনটে লোকের চলাফেরা করার অদ্ভুত ভঙ্গিমা দেখেই আমি অবাক হলাম বেশি। ঠিক আড়ষ্ট নয়—কিন্তু কেমন যেন বিকৃতভঙ্গি—যেন পায়ের জোড়গুলো ভুল জায়গায় পড়েছে। বয়স্ক মানুষটি ততোক্ষণে কুকুরগুলোকে নিয়ে তীরে নেমে পড়েছেন। কুকুরগুলো তখনও গর্জন করছে, শিকল টেনে তেড়ে যেতে চাইছে ওই লোকগুলোর দিকে। ওরা তিনজন অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলো। তীরে আমাদের অপেক্ষায় থাকা লোকটা উত্তেজিত ভাবে কিচিরমিচির করে ওদের কি যেন বলতে শুরু করলো। মনে হলো ভাষাটা আমার অপরিচিত, কিন্তু এমন কণ্ঠস্বর আমি আগে যেন কোথায় শুনেছি—কোথায়, তা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। ইতিমধ্যে মণ্টগোমেরিও লঞ্চ থেকে নেমে মালপত্র নামাবার জন্যে তৈরি হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের অনাহার এবং খালি মাথায় এতোক্ষণ রোদের মধ্যে থাকায় আমার শরীর এতোই দুর্বল লাগছিলো যে আমি আর ওদের সাহায্য করার জন্যে এগুতে পারলাম না।

একটু পরেই বয়স্ক ভদ্রলোকটির যেন হঠাৎ আমার উপস্থিতির কথা মনে পড়লো। এগিয়ে এসে উনি বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে আপনার বোধহয় সকাল বেলার জলখাবারটা খাওয়া হয়নি। এ জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমন্ত্রিত না হলেও এখন আপনি আমাদের অতিথি, আমাদের কর্তব্য

আপনার সুখ-সুবিধের বন্দোবস্ত করা।' ঘন ভুরুর নিচে ছোটো ছোটো দুটি উজ্জ্বল কালো চোখ মেলে ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন, 'মিঃ প্রেনডিক, মণ্টগোমেরি বলেছে আপনি শিক্ষিত মানুষ—বলেছে বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনি কিছুটা জানেন। কতোটা জানেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

বললাম, আমি রয়্যাল কলেজ অফ সায়েন্সে কয়েকটা বছর কাটিয়েছি। জীব-বিজ্ঞান নিয়ে হাক্সলির অধীনে কিছু গবেষণাও করেছি। কথাটা শুনে ভদ্রলোক ভ্রূজোড়া সামান্য উঁচু করে খানিকটা শ্রদ্ধার স্বরে বললেন, 'তাহলে অবস্থাটার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটলো। এখানে আমরা দুজন জীববিজ্ঞানী রয়েছি—আমি আর মণ্টগোমেরি। আর এই দ্বীপটা—বলতে পারেন এটা জীববিজ্ঞানের একটা কার্যালয়।'

সাদা-পোশাক-পরা লোকগুলো চাকা লাগানো খাঁচাসুদ্ধ পুমাটাকে ঠেলতে ঠেলতে পাঁচিল-ঘেরা চত্বরটার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো। ভদ্রলোক খানিকক্ষণ ওই দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কবে এখান থেকে যেতে পারবেন, বলতে পারি না। এ দ্বীপটা জাহাজ যাতায়াতের পথে পড়ে না। বারো মাসে আমরা হয়তো একটা জাহাজ দেখতে পাই।'

হঠাৎ আমাকে একা ফেলে রেখে, সাদা পোশাকের লোকগুলোকে পেরিয়ে উনি সৈকত ধরে এগিয়ে গেলেন—সম্ভবত ওই ঘেরা চত্বরটাতে গিয়ে ঢুকলেন। অন্য লোক দুটো তখন মণ্টগোমেরির সঙ্গে ছোটখাটো মালপত্রগুলোকে একটা নিচু ঠেলাগাড়িতে সাজিয়ে রাখছিলো। খরগোশের খাঁচাগুলো আর লামাটা তখনও লঞ্চে রয়েছে, স্ট্যাগ হাউণ্ডগুলোও বাঁধা রয়েছে সেখানে। একটু বাদেই মণ্টগোমেরি এগিয়ে এসে আমার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন,'আমার দিক থেকে আমি কিন্তু এতে খুশিই হয়েছি। ক্যাপটেনটা একটা নিরেট গর্দভ। ওর কাছে থাকলে ও আপনাকে খুব মজা দেখাতো।'

বললাম, 'এবারেও আপনি আমাকে বাঁচালেন।'

'দেখা যাক। তবে এটুকু বলছি, এই দ্বীপটা কিন্তু ভীষণ বাজে জায়গা। আপনার মতো অবস্থায় পড়লে আমি এখানে খুব সাবধানে নজর রেখে চলতাম। উনি...' কি একটা কথা বলতে গিয়ে মণ্টগোমেরি যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। তারপর মনে হলো ঠোঁটের কথাটা বদলে নিয়ে উনি বললেন, 'খরগোশ-গুলোকে নামাবো—আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন আসুন।'

খরগোশগুলোকে নিয়ে মণ্টগোমেরি ভারি মজার কাণ্ড করলেন। ওঁর সঙ্গে

জল ভেঙে এগিয়ে গিয়ে একটা খাঁচা আমরা তীরে নিয়ে এলাম। খাঁচাটার একটা দিক উঁচু করে তুলে ধরে দরজাটা খুলে দিতেই, খরগোশগুলো একটার পিঠে আর একটা হুড়মুড় করে মাটিতে এসে পড়লো। মণ্টগোমেরি হাততালি দিতে লাগলেন আর ওরা—মোট গোটা পনেরো-কুড়ি খরগোশ—লাফাতে লাফাতে সমস্ত সৈকতে ছড়িয়ে পড়লো। মণ্টগোমেরি বললেন, 'যাও বন্ধুগণ, বংশবৃদ্ধি করে তোমরা সংখ্যায় বেড়ে ওঠো। ভরিয়ে ফেলো দ্বীপটাকে। এতো দিন এখানে মাংসের বড়ো অনটন গেছে।'

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খরগোশগুলোর উধাও হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করছিলাম। ইতিমধ্যে সাদা-চুলওলা ভদ্রলোক এক ফ্লাস্ক ব্র্যাণ্ডি আর কয়েকখানা বিস্কুট নিয়ে এসে বললেন, 'প্রেনডিক, আপাতত এগুলো দিয়ে চালান।' ওঁর কণ্ঠস্বরে আগের চাইতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গতার সুর।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে অবিলম্বে বিস্কুটগুলোকে কাজে লাগাতে শুরু করলাম। ততোক্ষণে সাদা-চুলওলা ভদ্রলোকের সাহায্যে মণ্টগোমেরি আরও গোটা কুড়ি খরগোশকে দ্বীপে ছেড়ে দিলেন। অবিশ্যি পুমাটার সঙ্গে বড়ো বড়ো তিনটে খরগোশের খাঁচাও বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

জন্ম থেকে আমি মদ খাই না, তাই ব্র্যাণ্ডিটা আর স্পর্শ করলাম না।

বন্ধ দরজা

পাঠক হয়তা বুঝতে পারবেন, প্রথমটাতে চারদিকের সমস্ত কিছুই আমার কাছে এতো অদ্ভুত লাগছিলো এবং এমন অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চকর অভিযানের ফল-স্বরূপ আমি ওই পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়েছিলাম যে তখন কোনটার চাইতে কোনটা বেশি আশ্চর্যজনক সে বিষয়ে কোনো আপেক্ষিক ধারণাই আমার মনে গড়ে ওঠেনি। লামাটাকে অনুসরণ করতে করতে আমি সমুদ্রের তীর ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছিলাম, মণ্টগোমেরি পেছন থেকে এগিয়ে এসে আমাকে ওই পাথুরে পাঁচিল ঘেরা চত্বরটাতে ঢুকতে বারণ করলেন। লক্ষ্য করলাম, খাঁচাসুদ্ধ পুমা আর ছোটোখাটো মালপত্রগুলোকে চত্বরটার প্রবেশপথের বাইরেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

পেছনে তাকিয়ে দেখি, মালপত্র নামানোর পর খালি লঞ্চটাকে সৈকতে টেনে

তোলা হচ্ছে। সাদা-চুলওলা ভদ্রলোক আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। মণ্টগোমেরিকে লক্ষ্য করে উনি বললেন, 'এবারে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে এই অনাহূত অতিথিটিকে নিয়ে। ওঁকে আমরা কি করবো?'

'বিজ্ঞান-বিষয়ে উনি কিছুটা জানেন,' মণ্টগোমেরি বললেন।

'এই নতুন জিনিসটাকে নিয়ে ফের কাজে লাগার জন্যে আমি একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি,' ঘেরা চত্বরটার দিকে মাথা নেড়ে সাদা-চুলওলা ভদ্রলোকটি বললেন। ওঁর চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠলো।

'আমারও তাই ধারণা,' মণ্টগোমেরির কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার সুর ফুটলো না।

'আমরা ওঁকে ওখানেও পাঠাতে পারি না, আবার নতুন একটা ঝুপড়ি বানিয়ে নেবার মতো সময়ও আমাদের নেই। এখুনি নিশ্চয়ই ওঁকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলা যায় না!'

'ওখানে' বলতে উনি কি বোঝালেন, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। তবু বললাম, 'এখন আমি আপনাদের হাতে।'

'আমিও ঠিক তা-ই ভাবছিলাম,' মণ্টগোমেরি বললেন। 'আমার ঘরে বাইরের দিকে একটা দরজা আছে…'

সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক ভদ্রলোকটি মণ্টগোমেরির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তাহলে ঠিক আছে।' আমরা তিনজনে সেই ঘেরা চত্বরটার দিকে এগুতে লাগলাম। উনি ফের বললেন, 'আপনার কাছে একটু গোপনীয়তা রাখতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, মিঃ প্রেনডিক। কিন্তু মনে রাখবেন আপনি এখানে অনাহূত। আমাদের এই ছোট্ট জায়গাটাতে একটা গোপন ব্যাপার আছে, আসলে এটা একটা গোপন-কুঠরি। অবিশ্যি একজন সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষের কাছে এটা খুব একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার কিছু নয়, কিন্তু এই মূহূর্তে…যেহেতু আমরা আপনাকে ঠিক চিনি না…'

'অবশ্যই,' আমি বললাম, 'আমি তেমন বোকা নই যে আপনারা বিশ্বাস করে বলতে না পারলে আমি কিছু মনে করবো।'

মৃদু হাসিতে ভদ্রলোকের ভারি ঠোঁট দুখানা একটু কুঁচকে উঠলো। যে সমস্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ শুধু ঠোঁটের প্রান্তভাগ দুটি নিচু করে হাসেন, উনি তাঁদেরই একজন। মাথা নেড়ে উনি আমার কথায় সায় জানালেন। ততোক্ষণে আমরা চত্বরের সদর দরজাটা পেরিয়ে এসেছি। লোহার ফ্রেমে আঁটা কাঠের ভারি দরজা, তাতে তালা লাগানো। কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে আমরা একটা ছোটো দরজার কাছে হাজির হলাম—এটা আমি আগে লক্ষ্য করিনি। সাদা-

চুলওলা ভদ্রলোক তাঁর নোংরা নীল কোটটার পকেট থেকে একতাড়া চাবি বের করে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ওঁর চাবিগুলো এবং চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও এ জায়গাটাকে এমন বিশদভাবে তালা দিয়ে আটকে রাখার ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকলো।

ভদ্রলোককে অনুসরণ করে আমি ছোট্ট একখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটাতে সাধারণ কয়েকখানা আসবাব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তেমন করে নজর দেওয়া হয়নি। ভেতরের দিকে একটা দরজা। দরজাটা সামান্য খোলা। দরজার ওধারে একটা বাঁধানো উঠোন। ভেতর দিককার এই দরজাটা মণ্টগোমেরি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলেন। ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে একটা দড়ির দোলনা, ছোট্ট একটা নিষ্প্রভ জানলা, তাতে লোহার গরাদ বসানো। জানলা দিয়ে বাইরের সমুদ্র চোখে পড়ে।

সাদা-চুলওলা ভদ্রলোকটি জানালেন, এটাই আমার আস্তানা হবে। ভেতর দিককার দরজাটা 'দুর্ঘটনা হবার আশংকা থাকায়' উনি অন্য দিক থেকে চাবি দিয়ে রাখবেন বললেন। জানলার কাছে রাখা একখানা ডেক-চেয়ার আর একরাশ পুরনো বইয়ের দিকেও উনি আমার দৃষ্টি আকষণ করলেন। দেখলাম, দোলনার কাছে রাখা শেলফটার অধিকাংশ বই-ই শল্যবিদ্যার আর ল্যাটিন ও গ্রীক ধ্রুপদী সাহিত্যের—যে দুটো ভাষায় আমি তেমন সড়গড় নই। বাইরের দিকের দরজাটা দিয়েই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—যেন এড়িয়ে যেতে চাইলেন ভেতরের দরজা ফের খোলার ব্যাপারটা।

'সাধারণত এখানেই আমরা খাওয়াদাওয়া করি,' মণ্টগোমেরি বললেন। তার-পরেই যেন কি মনে হওয়ায়, উনিও অন্যজনের পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শুনতে পেলাম উনি ডাকলেন, 'মোরো!' মুহূর্তের জন্যে ব্যাপারটা আমি বোধহয় তেমন করে খেয়াল করিনি। কিন্তু তারপরেই শেলফের বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ মনে হলো, মোরো নামটা আমি আগে কোথায় শুনেছি?

জানলার কাছে বসে অবশিষ্ট বিস্কুটগুলো চমৎকার তৃপ্তি নিয়ে খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম, সেই সাদা পোশাক পরা একটা অদ্ভুত মানুষ একটা প্যাকিং বাক্স নিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে এগিয়ে চলেছে। পরক্ষণেই জানলার ফ্রেমে আড়াল হয়ে গেলো লোকটা। তারপর শুনতে পেলাম, আমার পেছন দিককার দরজাটাতে চাবি লাগিয়ে, চাবি ঘোরানো হলো। একটু পরেই বন্ধ দরজার ওধার থেকে স্ট্যাগ হাউণ্ডগুলোর আওয়াজ শোনা গেলো। কুকুরগুলো ঠিক ডাকছিলো না,

শুধু গন্ধ শুঁকছিলো আর কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চাপা গর্জন করছিলো। ওদের দ্রুত পা দাপড়ানোর আওয়াজ আর ওদের শান্ত করার প্রচেষ্টায় মণ্টগোমেরির কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছিলাম আমি।

এই জায়গাটার গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে ওই মানুষ দুটির এমন বিশদ প্রচেষ্টা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে রাখলো। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই আমি এই ব্যাপারটা এবং 'মোরো' নামটার কথা চিন্তা করছিলাম। কিন্তু মানুষের স্মৃতিশক্তি এমনই অদ্ভুত যে তখন ওই সুপরিচিত নামটা আমি কিছুতেই সঠিক সূত্রে গেঁথে মনে করে উঠতে পারছিলাম না। সেখান থেকে আমার চিন্তাধারা ফিরে গেলো সমুদ্র-সৈকতে সাদা-ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ওই অদ্ভুত বিকলাঙ্গ মানুষগুলোর দিকে। কি অদ্ভুতভাবে বাক্সটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো ওরা! অমন বিটকেলে চলন ভঙ্গিমা আমি আজ অব্দি দেখিনি। মনে পড়লো, ওরা কেউই আমার সঙ্গে কথা বলেনি। অথচ ওদের মধ্যে অনেককেই আমি কোনো না কোনো সময়ে এক অদ্ভুত চোরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি—যে দৃষ্টি আদৌ অসভ্য বর্বর মানুষদের মতো সরল বা অকপট নয়। ওরা কেউই যেন কথা বলতে চায় না, এটা ওদের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর কথা বললে বোঝা যায়, ওরা এক অদ্ভুত গা-ছমছমে অতিপ্রাকৃত কণ্ঠস্বরের অধিকারী। কেন ওরা এমন, কি হয়েছে ওদের? তারপরেই মণ্টগোমেরির সেই কিম্ভূতকিমাকার পরিচারকটির চোখ দুটোর কথা মনে পড়লো আমার।

ভাবতে ভাবতেই লোকটা আমার ঘরে এসে ঢুকলো। ওর পরনে সাদা পোশাক, হাতের ছোট্ট ট্রেতে কফি আর কিছু সিদ্ধ সবজি। ওকে এগিয়ে এসে নম্রভাবে নিচু হয়ে আমার সামনের টেবিলে ট্রেটা রাখতে দেখে, আমি কিছুতেই ঘেন্নায় নিজের শিউরে ওঠাটা চেপে রাখতে পারলাম না। তারপরেই এক প্রবল বিস্ময় আমাকে পঙ্গু করে দিলো। ছোটো ছোটো কালো চুলের নিচে ওর কান দুটো আমি দেখতে পেলাম। আমার মুখের কাছাকাছি এসে কান দুটো হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো। আমি দেখলাম, লোকটার কান দুটো ছুঁচোলো—হালকা বাদামি লোমে ঢাকা!

'আপনার সকাল বেলাকার জলখাবার, স্যার,' লোকটা বললো।

কোনো জবাব দেবার চেষ্টা না করে আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, যেতে যেতে অদ্ভুতভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আমার দিকে।

আমি চোখ মেলে লোকটার চলে যাওয়া লক্ষ্য করছিলাম এবং ওইভাবে

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অচেতন-মস্তিষ্কতন্ত্রীর এক আকস্মিক চাঞ্চল্যে আমার মনে একটা শব্দসমষ্টি জেগে উঠলো—'মোরো…আশঙ্কা।' তাই কি? মোরো…? হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আমার স্মৃতি দশ বছর আগে ফিরে গেলো। 'মোরো আতঙ্ক।' কথাটা মুহূর্তের জন্যে এলোমেলোভাবে আমার মনে ভেসে বেড়ালো। তারপরেই দেখতে পেলাম, বাদামি রঙের একটা ছোট্ট পুস্তিকায় লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে শব্দগুলো—যে পুস্তিকাখানা পড়লে শরীর ঘৃণায় শিউরে ওঠে, ভয়ে কুঁকড়ে যায়। এবারে সমস্ত ঘটনাটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গেলো—দীর্ঘদিন আগে ভুলে যাওয়া পুস্তিকাখানা সমস্ত চমকপ্রদ বিশদ বিবরণ নিয়ে ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আমি তখন নেহাতই বালক আর মোরোর বয়েস সম্ভবত পঞ্চাশ। উনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শারীর-বিজ্ঞানী—নিজের অসাধারণ কল্পনাশক্তি এবং আলোচনাকালে যুক্তি-প্রয়োগের পাশব-নির্মমতার জন্যে বিজ্ঞানী মহলে উনি ছিলেন সুপরিচিত।

ইনিই কি সেই মোরো? এক দেহের রক্ত অন্য দেহে সঞ্চালন সম্পর্কে তিনি নিদারুণ চমকপ্রদ কিছু তথ্য ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া রুগ্ন, অপুষ্ট দেহ সম্পর্কেও তিনি কিছু মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন বলে জানা যায়। তারপরেই আচমকা তাঁর কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁকে ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হয়। চাঞ্চল্যকর কিছু খবর ফাঁস করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে একজন সাংবাদিক কর্মচারীর বেশে তাঁর গবেষণাগারে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলো এবং এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সহায়তা পেয়ে—যদি আদৌ সেটা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে—তার ভয়াবহ পুস্তিকাটি কুখ্যাত হয়ে ওঠে। পুস্তিকাটি প্রকাশের দিনই ছাল-ছাড়ানো এবং কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন অবস্থায় একটা কুকুর মোরোর বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো।

সেই বছরই একজন বিশিষ্ট সংবাদপত্র-সম্পাদক—যিনি গবেষণাগারের একজন অস্থায়ী কর্মীর সম্পর্কিত ভাই—জাতির বিবেকের কাছে বিষয়টির সম্পর্কে আবেদন তুলে ধরেন। গবেষণার প্রণালীর বিরুদ্ধে বিবেকের বিক্ষোভ সেটাই প্রথম নয়। স্রেফ সোরগোল তুলেই ডক্টর মোরোকে তখন দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়। হয়তো উপযুক্ত শাস্তিই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন যেভাবে অন্যান্য গবেষক-বন্ধুরা তাঁকে ক্ষীণ সমর্থন জানিয়েছিলো এবং অধিকাংশ বিজ্ঞান-কর্মীরা যেভাবে তাঁকে বর্জন করেছিলো, তা আজও আমি লজ্জাজনক বলে মনে করি। অবিশ্যি সাংবাদিকটির বিবরণ অনুযায়ী তাঁর কিছু কিছু গবেষণামূলক পরীক্ষা সত্যিই

বেহিসাবী নিষ্ঠুর হয়েছিলো। হয়তো নিজের গবেষণার কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি সামাজিক শান্তিও অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু মনে হয়, গবেষণার মায়াজালে বিমুগ্ধ অধিকাংশ মানুষের মতো ডক্টর মোরোও গবেষণার কাজকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছিলেন। উনি তখন অবিবাহিত, আর সত্যি বলতে কি নিজের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর তখন চিন্তা করার ছিলো না…

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, ইনি নিশ্চয়ই সেই একই ব্যক্তি। সমস্ত কিছুই সেই সিদ্ধান্তের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। এবারে বুঝতে পারলাম পুমা আর অন্যান্য জন্তুগুলোর কপালে কি রয়েছে, কেন অন্য সমস্ত মালপত্রের সঙ্গে ওদেরও এখন পেছন দিককার ঘেরা চত্বরটাতে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা অদ্ভুত মৃদু গন্ধ, কিসের যেন একটা পরিচিত গন্ধ এতোক্ষণ আমার চেতনার আড়ালে লুকিয়ে ছিলো —হঠাৎ আমি গন্ধটা চিনতে পারলাম। ওটা অস্ত্রোপচার ঘরের বীজাণুনাশক ওষুধের গন্ধ। দেয়ালের এধার থেকে আমি পুমাটার গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম, শুনতে পেয়েছিলাম একটা কুকুরের করুণ আর্তনাদ—যেন আঘাত পেয়ে কাঁদছে কুকুরটা।

কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে গবেষণার জন্যে জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গব্যবচ্ছেদের ব্যাপারটা অবশ্যই এমন কিছু ভয়ঙ্কর কাণ্ড নয় যে তা এমন করে গোপন রাখতে হবে! হঠাৎ মণ্টগোমেরির পরিচারকটির সেই ছুঁচোলো কান আর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো এক সুস্পষ্ট অর্থ নিয়ে ফের আমার মনে জেগে উঠলো। সতেজ বাতাসে ফেনায়িত সবুজ সমুদ্রের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলাম আমি, আর আমার মনের মধ্যে গত কয়েক দিনের বিচিত্র স্মৃতিগুলো ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াতে লাগলো পরস্পরকে।

কি অর্থ হতে পারে এসবের? নির্জন দ্বীপে পাঁচিল-ঘেরা তালাবন্ধ একটা চত্বর, কুখ্যাত এক জীবব্যবচ্ছেদী আর বিকৃত বিকলাঙ্গ এই মানুষগুলো?…

পুমার কান্না

মণ্টগোমেরি আমার বিহ্বল চিন্তাজালে বাধা দিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর পরিচারকটি একটা ট্রেতে করে রুটি, কিছু সবজি আর অন্যান্য খাবার, এক ফ্লাস্ক হুইস্কি, এক পাত্র জল, তিনটে কাচের গ্লাস আর ছুরি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। অপাঙ্গে ওই বিচিত্র প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে তার আশ্চর্য-অস্থির চোখ

দুটো মেলে আমাকে লক্ষ্য করছে। মণ্টগোমেরি জানালেন উনি আমার সঙ্গেই খাবেন, কিন্তু কাজে ব্যস্ত আছেন বলে মোরো আসতে পারছেন না।

'মোরো!' আমি বললাম, 'ওই নামটা আমার চেনা।'

'কি কেলেঙ্কারী, আপনি চেনেন!' মণ্টগোমেরি বললেন, 'আমি কি গাধা—নামটা আপনার সাক্ষাতে বলে ফেলেছি! এটা আমার ভেবে দেখা উচিত ছিলো। যাই হোক, এতে আপনি আমাদের রহস্যটার একটা সূত্র পাবেন। হুইস্কি দেবো?'

'না, ধন্যবাদ—আমি মদ খাই না।'

'ইস, আমিও যদি আপনার মতো হতাম! কিন্তু ঘোড়া চুরি যাবার পর দরজায় আর চাবি লাগাবার কোনো অর্থ হয় না। জানেন, ওই জঘন্য বস্তুটাই আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে দায়ী। ওই জিনিসটা আর কুয়াশায় ভরা একটা রাত। যেদিন মোরো আমাকে চলে আসার প্রস্তাব জানালেন, আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলাম। সে এক বিচিত্র…'

'মণ্টগোমেরি,' বাইরের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই আচমকা প্রশ্ন করলাম, 'আপনার লোকটার কান দুটো অমন ছুঁচোলো কেন?'

প্রথম গ্রাসটা মুখে নিয়ে মণ্টগোমেরি এক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আমার প্রশ্নটাই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'ছুঁচোলো কেন?'

'হ্যাঁ, একটু ছুঁচোলো,' দম চেপে রেখে যথাসম্ভব শান্ত গলায় বললাম, 'আর ধারগুলোতে পাতলা লোম।'

মণ্টগোমেরি ভীষণ চিন্তিত ভঙ্গিমায় নিজেই হুইস্কি আর জল ঢেলে নিলেন, 'আমার তো ধারণা ছিলো চুলেই ওর কান দুটো ঢাকা থাকে।'

'আপনি ওকে দিয়ে আমার কফি পাঠিয়েছিলেন। ও যখন নিচু হয়ে টেবিলে কফিটা রাখছে, তখন আমি ওর কান দুটো দেখতে পেলাম। আর ওর চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলে।'

ততোক্ষণে মণ্টগোমেরি বিস্ময়ের ঘোর থেকে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। চিন্তিত সুরে একটু ঝোঁক দিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমার সব সময়েই মনে হতো ওর কান দুটোতে কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। যেভাবে ও কান দুটোকে ঢেকে রাখে…আচ্ছা, কান দুটো দেখতে ঠিক কি রকম বলুন তো?'

মণ্টগোমেরির হাবভাব দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম, উনি অজ্ঞতার ভান করছেন। কিন্তু একটা লোককে তো আর এ কথা বলা যায় না যে আমি তাকে

মিথ্যেবাদী বলে মনে করছি! তাই বললাম, 'ছুঁচোলো, খানিকটা ছোটো আকারের আর লোমে ঢাকা—রীতিমতো রোমশ। কিন্তু পুরো মানুষটাই কেমন যেন অদ্ভুত —এমনটি আমি জীবনেও দেখিনি।'

আমাদের পেছনের ঘেরা চত্বরটা থেকে কোনো যন্ত্রণা-কাতর জন্তুর একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ আর্তনাদ ভেসে এলো। কণ্ঠস্বরের গভীরতায় বোঝা গেলো, জন্তুটা পুমা। দেখলাম মণ্টগোমেরি আর্তনাদটা শুনে কুঁকড়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, কি বলছিলেন যেন?' উনি জিজ্ঞেস করলেন।

'ওকে আপনি কোত্থেকে যোগাড় করলেন?'

'ইয়ে—স্যান ফ্র্যানসিসকো থেকে।··· স্বীকার করছি লোকটার চেহারা পশুর মতো কদাকার। তা ছাড়া আধ-পাগলা। ওর দেশ কোথায়, ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে ওর চেহারা আর হাবভাবে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা দুজনেই। আপনার কেমন লাগে ওকে?'

'লোকটা অস্বাভাবিক। ওর মধ্যে কি যেন একটা ব্যাপার আছে।··· আপনি আমাকে কল্পনাপ্রবণ বলে মনে করবেন না—কিন্তু ও কাছে এলেই আমার যেন একটা ঘিনঘিনে অনুভূতি হয়, মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠে আসলে···আসলে মনে হয় ও একটা শয়তান, একটা দানব।'

মণ্টগোমেরি খাওয়া বন্ধ করে আমার কথা শুনছিলেন। বললেন, 'আমার তো তা মনে হয় না।' তারপর ফের খেতে খেতে বললেন, 'এমন কোনো ধারণাই আমার ছিলো না। তবে ওই জাহাজের নাবিকগুলো···ওরাও নিশ্চয়ই তেমনি কিছু অনুভব করেছিলো। বেচারাকে ওরা তো জ্বালিয়ে মেরেছে! ক্যাপটেনটাকে দেখেছিলেন তো?'

আচমকা পুমাটা ফের গর্জন করে উঠলো—এবারে কণ্ঠস্বরটা আগের চাইতেও বেশি যন্ত্রণাকাতর। মণ্টগোমেরি নিঃশ্বাস চেপে একটা শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন। ভাবছিলাম সমুদ্রতীরের লোকগুলোর সম্পর্কে ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। কিন্তু হতভাগ্য পশুটা তখনই একটানা ক্রমাগত তীক্ষ্ণ সুরে চিৎকার করতে শুরু করলো। তবু প্রশ্ন করলাম, 'সমুদ্রের ধারে আপনার ওই যে লোকগুলো···ওরা কোন জাতের মানুষ?'

'ভারি চমৎকার লোকগুলো, তাই না?' মণ্টগোমেরি অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন। জন্তুটা ফের তীক্ষ্ণভাবে আর্তনাদ করতেই ওঁর ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো।

আমি আর কিছু বললাম না। জন্তুটা আবার আগের চাইতেও বিশ্রীভাবে

চিৎকার করে উঠলো। বিষণ্ণ দুটি ধূসর চোখ মেলে মণ্টগোমেরি আমার দিকে তাকালেন, তারপর হুইস্কি ঢেলে নিলেন আরও খানিকটা। উনি আমাকে অ্যালকোহল সম্পর্কিত আলোচনায় টেনে নিতে চেষ্টা করছিলেন, বোঝাতে চাইছিলেন যে মদের কল্যাণেই আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। আমি যে ওঁর কাছে জীবনের জন্যে ঋণী, মনে হলো এ কথাটা জোর দিয়ে বোঝাবার ব্যাপারে উনি খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। এলোমেলোভাবে আমি ওঁর কথার জবাব দিলাম।

খানিকক্ষণের মধ্যেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলো। ছুঁচোলো-কান সেই দানবটা টেবিল সাফ করে দিয়ে গেলো। মণ্টগোমেরিও ফের আমাকে একা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এতোক্ষণ পুরো সময়টাই মনে হচ্ছিলো ব্যবচ্ছিন্ন পুমাটার তীব্র চিৎকারে উনি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, কিছুতেই নিজের সেই বিরক্তি লুকিয়ে রাখতে পারছেন না। নিজের দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রীর কথাও আমাকে বলছিলেন উনি। একা হয়ে আমি দেখলাম, পুমাটার ওই চিৎকার সত্যিই ভারি বিরক্তিকর। বেলা যতোই বিকেলের দিকে গড়াতে লাগলো, চিৎকারটা ততোই তীব্র আর করুণ হয়ে উঠতে লাগলো। প্রথমটাতে ওর চিৎকারে আমার দুঃখ হচ্ছিলো, কিন্তু ক্রমাগত ওই চিৎকার আমার মানসিক ভারসাম্যকে টলিয়ে দিলো। হোরাসের একখানা আক্ষরিক অনুবাদ পড়তে শুরু করেছিলাম—বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি হাত দুটো মুঠি বন্ধ করতে শুরু করলাম, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগলাম, তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করলাম একটানা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে কানে আঙুল ঢোকাতে হলো। পুমাটার চিৎকারের করুণ আবেদন ক্রমশ আমার স্নায়ুতন্ত্রীতে চেপে বসছিলো। শেষ অব্দি অবস্থাটা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে ঘরের মধ্যে থেকে ওই আর্তনাদ সহ্য করা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠলো। ঘরের দরজা দিয়ে আমি বিকেলের ঘুম-ঘুম উষ্ণতায় বেরিয়ে এলাম, হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে গেলাম বাইরের বড়ো ফটকটা।

ঘরের বাইরে এসে চিৎকারটা যেন আরও জোরে শোনা যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা যেন আত্মপ্রকাশের ওই একটিই কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছে। প্রাণীটা যদি বোবা হতো, তাহলে পাশের ঘরে একটা চরম যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা ঘটছে জানলেও সম্ভবত আমি তা দিব্যি সহ্য করতে পারতাম—এতোক্ষণ যেমন করেছি। কিন্তু যন্ত্রণা যখন প্রকাশের কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়ে আমাদের স্নায়ুগুলোতে কাঁপন ধরায়, তখনই দয়া-মায়া-করুণার অনুভূতি আমাদের বিব্রত করে তোলে। বাইরে ঝলমলে রোদ, সমুদ্রের স্নিগ্ধ বাতাসে দুলে দুলে উঠছে গাছগাছালির

সবুজ পাতা। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্রুতির নাগাল না পেরোনো অব্দি পৃথিবীটাকে আমার মনে হচ্ছিলো যেন লাল-কালোয় মেশা এক অলীক বিভ্রান্তি।

অরণ্যের অদ্ভুত

কুটিরের পেছন দিকে বুনো আগাছায় ভরা একটা ঢিবি। কোথায় চলেছি না ভেবেই আমি ওই আগাছার ভেতর দিয়ে পা চালিয়ে দিলাম। ঘন গাছগাছালির ছায়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটু বাদেই দেখি, আমি ঢিবিটার অন্য ধারে পৌঁছে গেছি। নিচের সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটা দিয়ে ছোট্ট একটা নদী বয়ে চলেছে। খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে আমি কান পেতে রইলাম। এতোটা দূরে চলে আসার জন্যেই হোক বা ঘন গাছপালার আড়ালের জন্যেই হোক, চত্বরের ভেতরকার কোনো আওয়াজ এখানে এসে পৌঁছোচ্ছে না। বাতাস একেবারে স্থির। হঠাৎ খসখস শব্দ তুলে কোত্থেকে যেন একটা খরগোশ এসে হাজির হলো, তারপর আমার সামনে দিয়ে লাফাতে লাফাতে ঢিবিটা দিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেলো। সামান্য ইতস্তত করে আমি ছায়ার প্রান্তসীমায় গিয়ে বসে পড়লাম।

জায়গাটা বেশ সুন্দর। তীরের ঘন গাছপালায় নদীটা একেবারে আড়াল হয়ে গেছে—শুধু একটা ফোকর দিয়ে আমি ত্রিভুজাকৃতি খানিকটা চকচকে জল দেখতে পেলাম। নদীর ওধারে নীলাভ কুয়াশার আড়ালে শুধু গাছগাছালি আর লতাপাতার নিবিড় জটলা এবং তার ওপরে আবার সেই ঝলমলে উজ্জ্বল নীল আকাশ। এখানে-সেখানে কয়েকটা সাদা বা টুকটুকে লাল পরগাছা ফুলের ঝিলিক। খানিকক্ষণ এই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিকেই আমি চোখ মেলে রাখলাম, তারপরেই মনে পড়লো মণ্টগোমেরির সেই অদ্ভুত লোকটার কথা। কিন্তু এতো গরমে বিশদভাবে কিছু চিন্তা করা যায় না। একটু বাদেই আমি তন্দ্রা আর জাগরণের মধ্যে এক নিবিড় শান্তিতে ঢলে পড়লাম।

কতোক্ষণ বাদে জানি না, নদীর ওধারে সবুজ গাছগাছালির ভেতর থেকে আসা একটা মৃদু খসখসানি আমাকে তন্দ্রা থেকে জাগিয়ে তুললো। মুহূর্তের জন্যে দুলে দুলে ওঠা ফার্ণ আর শর গাছগুলোর মাথা ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপরেই হঠাৎ নদীর ধারে কি যেন একটা এসে হাজির হলো। প্রথমে বুঝতেই পারলাম না, ওটা কি। নদীর ধারে এসে প্রাণীটা মাথা নিচু করে

জল খেতে শুরু করলো। তখন দেখলাম ওটা মানুষ, এতোক্ষণ ও চার হাত-পায়ে হাঁটছিলো!

লোকটার গায়ের রঙ তামাটে, মাথায় কালো চুল, পরনে নীলচে পোশাক। মনে হলো চেহারার অদ্ভুত কদর্যতাই এই দ্বীপের অধিবাসীদের এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। লোকটার জল চুষে খাবার চুক চুক আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। ওকে একটু ভালো করে দেখবো বলে সামনের দিকে ঝুঁকতেই আমার হাতে লেগে একটা আগ্নেয় শিলা নিচের দিকে গড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা অপরাধীর মতো মুখ তুলে তাকাতেই আমার চোখে ওর চোখ পড়লো। তক্ষুনি পায়ে ভর রেখে উঠে দাঁড়ালো ও, হাত দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে লক্ষ্য করতে লাগলো আমাকে। ওর পা দুটোর দৈর্ঘ্য পুরো শরীরটার অর্ধেকও হবে কি না সন্দেহ। প্রায় মিনিটখানেক আমরা দুজন দুজনের দিকে অমনি বিব্রতভাবে তাকিয়ে রইলাম। তারপর দু-এক বার পেছনের দিকে তাকিয়ে লোকটা ঝোপের ভেতর দিয়ে সরে পড়লো। ওর পায়ের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেলো। যেতে যেতেও লোকটা বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলো। সে উধাও হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও আমি তার চলে যাবার পথের দিকে চোখ মেলে রাখলাম। ততোক্ষণে আমার ঘুম-ঘুম শান্তিটুকুর পুরোটাই উধাও হয়ে গেছে।

হঠাৎ পেছন দিকে একটা শব্দ শুনে ভীষণ চমকে উঠে দেখি সাদা লেজ দুলিয়ে একটা খরগোশ চড়াইয়ের দিকে উঠে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আমিও এক লাফে উঠে পড়লাম। অর্ধেক-পশুর মতো আকৃতির ওই প্রাণীটার ভূতুড়ে আবির্ভাব আমার মনে বিকেল বেলার এই নির্জনতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিলো। খানিকটা বিচলিতভাবে আমি চারদিক তাকাতে লাগলাম, অনুতাপ হতে লাগলো আমি নিরস্ত্র বলে। তারপর ভেবে দেখলাম, এইমাত্র যে লোকটাকে আমি দেখেছি তার পরনে নীলচে পোশাক ছিলো—অসভ্য বর্বর মানুষের মতো সে নগ্ন নয়। তাই নিজেকে আমি এই বলে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আসলে লোকটা হয়তো শান্ত প্রকৃতিরই, তার বিশ্রী চেহারাটাই আমার মনে তার সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে।

তবু ঠিক স্বস্তি পেলাম না। এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে ঢালের বাঁ দিক দিয়ে নেমে আমি ঋজু-কাণ্ডের গাছগুলোর ভেতর দিয়ে এগুতে লাগলাম। মানুষ কেন চার হাত-পায়ে হাঁটবে, মুখ নামিয়ে চেটে চেটে জল খাবে? একটু বাদেই ফের একটা পশুর তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলাম আমি এবং আর্তনাদটা পুমার ডাক

হবে বলে ধরে নিয়েই, যে দিক থেকে আওয়াজটা এসেছিলো ঠিক তার উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে নদী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম ওধারের আগাছায় ভরা চড়াইয়ের পথে।

হঠাৎ বেশ খানিকটা জমি জুড়ে টকটকে লাল রঙ দেখে আমি চমকে উঠলাম। কাছে গিয়ে দেখি আসলে ওগুলো এক জাতীয় ছত্রাক, স্পর্শ করলেই গলে চটচটে হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেই একটা অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখতে হলো। দেখলাম, ফার্ণের ছায়ায় একটা খরগোশের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। দেহটা তখনও উষ্ণ, মাছিতে ঢেকে রেখেছে, মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। চারদিকে ছিটকে পড়া রক্তের দৃশ্য দেখে আমি আতঙ্কে থমকে দাঁড়ালাম। অবশেষে এভাবেই দ্বীপের একটি আগন্তুকের জীবন-অবসান হলো!··· হিংস্রতার আর কোনো চিহ্ন নেই—দেখে মনে হয়, খরগোশটাকে যেন হঠাৎ তুলে নিয়ে মুণ্ডুটাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ভেবেই পেলাম না কাজটা কি করে করা হয়েছে। নদীর ধারে সেই মানুষটার অমানুষিক মুখ দেখার পর থেকে আমার মনে যে অস্পষ্ট আতঙ্কবোধটা জেগেছিলো এখন তা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলাম, এই অজানা অচেনা মানুষগুলোর মধ্যে এভাবে অভিযানে বেরিয়ে পড়াটা ঠিক হয়নি। চতুর্দিকের ঝোপঝাড়গুলো আমার কল্পনায় অন্য রকম হয়ে উঠলো। প্রতিটা ছায়াই ছায়ার চাইতে বেশি কিছু হয়ে উঠলো, মনে হতে লাগলো ওগুলো কোনো গুপ্ত-আশ্রয়—প্রতিটা খসখসানিকেই মনে হতে লাগলো কোনো বিপদের সঙ্কেত। মনে হলো অদৃশ্য কারা যেন লক্ষ্য করছে আমাকে।

ঠিক করলাম, আবার সেই চত্বরটার দিকেই ফিরে যাবো। তাই ফের একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌঁছবার বাসনায় আচমকা মুখ ঘুরিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে দুরন্ত বেগে—সম্ভবত পাগলের মতোই—ছুটিয়ে নিয়ে চললাম নিজেকে। কিন্তু একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবার ঠিক আগেই সময়মতো থমকে দাঁড়ালাম। জায়গাটার ওধারেই আবার ঘন জঙ্গল। আর সামনের ফাঁকা জায়গাটায় একটা লুটিয়ে পড়া বিশাল গাছের ওপরে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে তিনটে অদ্ভুত চেহারার মানুষ। তখনও ওরা আমার উপস্থিতি বুঝতে পারেনি। ওদের মধ্যে একজন স্পষ্টতই মেয়েমানুষ। কোমরে জড়ানো একটুকরো লাল কাপড় বাদে ওরা সম্পূর্ণ নগ্ন। গায়ের রঙ কেমন যেন ফ্যাকাসে গোলাপি—এর আগে কোনো বর্বর মানুষের আমি এমনধারা গায়ের রঙ দেখিনি। ওদের মুখগুলো ভারি, চিবুকহীন, কপাল

পেছন দিকে চাপা, মাথায় খোঁচা খোঁচা সামান্য চুল। এমন বিশ্রী-বিদঘুটে চেহারার প্রাণী আমি জন্মেও দেখিনি।

ওরা তিনজনে কথাবার্তা বলছিলো। কিংবা অন্তত একটি পুরুষ অন্য দুজনকে কিছু বলেছিলো এবং তিনজনেই এতো মগ্ন হয়ে ছিলো যে আমার এগিয়ে আসার কোনো শব্দই ওরা শুনতে পায়নি। ওদের প্রত্যেকেরই মাথা ও ঘাড় এধার থেকে ওধারে দুলছিলো। লোকটার গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলেও তার কথাগুলোর কোনো অর্থ ই আমি বুঝতে পারলাম না। মনে হলো সে দুর্বোধ্য জটিল কিছু আবৃত্তি করে চলেছে। একটু বাদেই তার কণ্ঠস্বর কর্কশ সুরে চিৎকৃত হয়ে উঠলো, দু হাত ছড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজনও উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত ছড়িয়ে তালে তালে শরীর দুলিয়ে সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো। তখনই লক্ষ্য করলাম ওদের পাগুলো অস্বাভাবিক বেঁটে বেঁটে, পায়ের পাতাগুলোও কেমন যেন অদ্ভুত। ওরা তিনজনই তখন পা দাপিয়ে হাত দুলিয়ে আস্তে আস্তে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করেছে। ওদের ছন্দময় আবৃত্তির মধ্যে যেন একটু সুরও ফুটে উঠলো—মনে হলো গানের ধুয়ায় ওরা 'আলুলা' বা 'বালুলা' জাতীয় কি যেন একটা বলছে। এক আশ্চর্য আনন্দের অভিব্যক্তিতে ওদের কুৎসিত মুখগুলো উজ্জ্বল, চোখগুলো ঝকঝকে—লালা গড়িয়ে পড়ছে ওদের ওষ্ঠবিহীন মুখ থেকে।

ওদের ওই অদ্ভুত অর্থহীন অঙ্গভঙ্গি দেখতে দেখতেই হঠাৎ এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম, কেন ওদের দেখে আমি চমকে উঠি, কেন ওদের দেখে পরস্পর-বিরোধী একটা মনোভাব আমাকে পেয়ে বসে, কেন মনে হয় ওরা আমার সম্পূর্ণ অচেনা অথচ ভীষণ পরিচিত। ওদের তিনজনেরই আকৃতি মানুষের মতো, কিন্তু ওদের সঙ্গে একটা পরিচিত জন্তুর ভীষণ মিল রয়েছে। মানুষের মতো চেহারা, প্রকৃতি এবং পরিচ্ছদ থাকা সত্ত্বেও ওদের হাঁটাচলা, অভিব্যক্তি এবং সম্পূর্ণ উপস্থিতিটাই নির্ভুল ও অনিবার্যভাবে শুয়োরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই অদ্ভুত উপলব্ধিতে হতবুদ্ধি হয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পরেই রাশি রাশি ভয়ঙ্কর প্রশ্ন আমার সমস্ত মন ছেয়ে ফেললো। ওরা তখন একজন একজন করে লাফাচ্ছে আর মুখ দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ করছে। লাফাতে লাফাতে ওদের মধ্যে একজনের পা পিছলে যেতেই মুহূর্তের জন্যে সে চার হাত-পায়ে শরীরের ভর সামলে নিয়ে ফের উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু ক্ষণিকের সেই দৃশ্যই ওই দানবগুলোর সত্যিকারের পশুসুলভ পরিচয় দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

যথাসম্ভব নিঃশব্দে আমি পেছন ফিরে চললাম। ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্তেই ডালপালা ভেঙে পড়ার শব্দ বা পাতার মৃদু খসখসানিতে আমি নিথর হয়ে উঠছিলাম, ঢুকে পড়ছিলাম ঝোপঝাড়ের গভীরে। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পরে, তবে আমি ফের সহজভাবে পথ চলার সাহস পেলাম।

সেই মুহূর্তে আমার একমাত্র চিন্তা ছিলো ওই জঘন্য প্রাণীগুলোর সংস্রব থেকে দূরে সরে যাওয়া—তাই খেয়ালই করিনি কখন আমি গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটা সরু পায়ে-চলা পথে এসে হাজির হয়েছি। তার পর একটা ফাঁকা জায়গা পেরোতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠে দেখি, আমার কাছ থেকে সম্ভবত গজ ত্রিশেক দূরে দুটো কুৎসিত পা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে আমার সমান্তরাল পথে এগুচ্ছে। লতাপাতার জটলায় তার মাথা এবং শরীরের ওপর দিকটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। হয়তো প্রাণীটা আমাকে দেখতে পায়নি ভেবে আমি আচমকা থমকে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটোও থেমে গেলো। আমি তখন এতো ভয় পেয়ে গেছি যে ইচ্ছে করছিলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাই। তবু অতিকষ্টে সামলে রাখলাম নিজেকে। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে ভালো করে তাকিয়ে ওর মাথা এবং দেহটা দেখে বুঝলাম, খানিকক্ষণ আগে আমি ওকেই নদী থেকে জল খেতে দেখে-ছিলাম। জীবটা মাথা ঘোরালো। গাছের ছায়া থেকে সে আমার দিকে তাকাতেই তার চোখ দুটো পান্নার মতো ঝলসে উঠলো, আবার মাথা ঘোরাতেই উধাও হয়ে গেলো সেই আধো-স্বচ্ছ রঙটা। মুহূর্তের জন্যে সে নিশ্চল হয়ে রইলো, তারপর নিঃশব্দে ছুটতে শুরু করলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। খানিকক্ষণের মধ্যেই সে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তখন আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু অনুভব করছিলাম আবার সে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

ও কি? মানুষ না পশু? আমাকে নিয়ে কি করতে চায় ও? আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই—এমন কি একটা লাঠি পর্যন্ত না। অতএব লড়াই করতে যাওয়া স্রেফ পাগলামো। তবে যে কারণেই হোক না কেন, আমাকে আক্রমণ করার মতো সাহস ওর নেই। দাঁতে দাঁত চেপে আমি সোজা ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। ভয়ে আমার মেরুদণ্ডটা যেন শিরশিরিয়ে উঠছিলো, কিন্তু ঠিক করেছিলাম কিছুতেই ওকে তা বুঝতে দেবো না। লম্বা লম্বা সাদা ফুলে ভরা একরাশ ঝোপঝাড় সরিয়ে দেখি, বিশ গজ দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে আমাকে লক্ষ্য করছে—যেন বুঝতে পারছে না কি করবে। এক দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আরও দু-এক পা সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি ?'

সে আমার চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করলো। তারপর হঠাৎ 'না!' বলে মুখ ঘুরিয়ে লাফাতে লাফাতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফের তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। গাছের নিচে ম্লান আলোয় চকচক করতে লাগলো তার চোখ দুটো।

আমার হৃৎপিণ্ডটা তখন ভয়ে যেন মুখের কাছে উঠে এসেছে। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওকে ধোঁকা দেওয়া। তাই সটান এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ও আবার মুখ ঘুরিয়ে গোধূলির অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলো। একবার মনে হলো ফের যেন ওর চোখের দ্যুতিটা দেখতে পেলাম—তারপর আর কিছু নেই।

এতোক্ষণে এই প্রথম অনুভব করলাম, এই পরিবেশে বেশি রাত অব্দি থাকাটা আমার পক্ষে কতোখানি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। মাত্র কয়েক মিনিট হলো সূর্য পাটে বসেছে, কিন্তু বিষুব অঞ্চলের গোধূলি বেলা ইতিমধ্যে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে পুবের আকাশ থেকে—একটা রাতের পোকা নিঃশব্দে উড়ছে আমার মাথার ওপরে। এই রহস্যময় অরণ্যের অজানা বিপদের মধ্যে আমি যদি রাত কাটাতে না চাই, তাহলে অবিলম্বে আমাকে সেই ঘেরাও চত্বরের দিকে ফিরে যেতে হবে। যন্ত্রণা-কাতর পশুর চিৎকারের কথা মনে হলে ওখানে ফিরে যাবার উৎসাহটা একেবারেই ফুরিয়ে যায়—কিন্তু খোলা জায়গায় অন্ধকার এবং অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হাজারো বিভীষিকার কাছে আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছে তার চাইতেও কম। যে নীল ছায়ার আড়ালে ওই অদ্ভুত প্রাণীটা হারিয়ে গিয়েছিলো ফের একবার সেদিকে তাকিয়ে আমি ঢাল দিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম, ফিরে চললাম যে দিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিকেই।

নানা ধরনের ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে দ্রুতপায়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই দেখি, আমি একটা সমতল ভূমিতে গিয়ে হাজির হয়েছি। চারদিকে ইতস্তত ছড়ানো-ছেটানো গাছপালা। সূর্যাস্তের রক্তরাগের পরেও চারদিকে যে পাণ্ডুর আভা ছড়িয়ে থাকে, তাও ক্রমশ অন্ধকার হয়ে উঠছে। মাথার ওপরে নীল আকাশটা মুহূর্তের মধ্যে গাঢ় হয়ে উঠলো, ম্লান আলোয় ছোটো ছোটো তারা জেগে উঠলো একের পর এক। দিনের আলোয় গাছপালার মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গাগুলোতে যে অস্পষ্ট নীলিমা জেগে থাকে, তাও হয়ে উঠলো অন্ধকার আর রহস্যময়।

আমি এগিয়ে চললাম। পৃথিবী থেকে সমস্ত রঙ মুছে গেছে। উজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে জেগে রয়েছে গাছগাছালির কালিমাখা চূড়ো, তার নিচে অন্ধকারে সবকিছু মিলেমিশে একাকার। একটু পরেই গাছের সংখ্যা কমে গিয়ে শুরু হলো বুনো ঝোপঝাড়ের প্রাচুর্য। তারপর সাদা বালিতে ঢাকা একটা নির্জন অঞ্চল। তারপর আবার খানিকটা ঝোপঝাড়ের ঘন জটলা।

কিছুক্ষণ ধরেই ডান দিক থেকে আসা একটা মৃদু খসখসানি আমাকে বিরক্ত করে তুলছিলো। প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা আমার মনের ভুল। কারণ আমি থামলে শব্দটাও থেমে যাচ্ছিলো—গাছের মাথায় সন্ধ্যার বাতাসের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না তখন। কিন্তু তারপর ফের আমি চলতে শুরু করলেই মনে হচ্ছিলো, আমি যেন নিজের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তাই এবারে ঝোপঝাড়গুলোর :কাছ থেকে সরে গিয়ে আমি একটু ফাঁকা জায়গা ধরে চলতে শুরু করলাম আর মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে ফিরে তাকাতে লাগলাম যাতে কেউ যদি সত্যি সত্যি আমাকে অনুসরণ করতে থাকে তো সে ঘাবড়ে যাবে। যদিও কিছুই দেখতে পেলাম না, তবু অন্য কারুর উপস্থিতি সম্পর্কে আমার অনুভূতিটা ক্রমশ আর দৃঢ় হয়ে উঠলো। মনে হলো অনুসরণকারী যে-ই হোক না কেন, হয় আমাকে আক্রমণ করার মতো সাহস তার নেই আর নয়তো কোনো অসুবিধেজনক পরিস্থিতিতে আমি পড়বো বলে সে অপেক্ষা করে রয়েছে। মাঝে মাঝেই আমি পেছন ফিরে দেখছিলাম আর নিজেকে এই বলে প্রায় বুঝিয়ে এনেছিলাম যে আমার অনুসরণকারীটি রণে ভঙ্গ দিয়েছে আর নয়তো পুরো ব্যাপারটাই স্রেফ আমার কল্পনা। তারপর সমুদ্রের কলতান আমার কানে এলো। চলার গতি বাড়িয়ে এবারে আমি প্রায় ছুটতে শুরু করলাম। আর ঠিক তখনই মনে হলো, আমার পেছনে কে যেন হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়লো। চকিতে পেছনের গাছগুলোর দিকে ফিরে তাকাতেই মনে হলো একটা কালো ছায়া যেন অন্য একটা ছায়ার ওপরে লাফিয়ে পড়লো। নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে আমি কান পেতে রইলাম, কিন্তু নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না। ভাবলাম আমার স্নায়ুগুলো বিচলিত হয়ে উঠেছে, অহেতুক কল্পনা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। তাই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ফের আমি সমুদ্রের দিকে এগুতে লাগলাম।

মিনিট খানেক চলার পরেই গাছপালা পাতলা হয়ে উঠলো। দেখলাম সামনের নিচু জমিটা এগিয়ে গিয়ে শান্ত সমুদ্রে লীন হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ নির্মেঘ রাত্রি। সমুদ্রের শান্ত তরঙ্গে থিরথির করে কাঁপছে অজস্র নক্ষত্রের ছায়া। খানিকটা

দূরে পাহাড়ের কোলে আছড়ে পড়া সমুদ্রের জল থেকে কেমন যেন একটা ম্লান আভা ফুটে উঠেছে। পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে দেখি রাশিচক্রের আলো সন্ধ্যা-তারার উজ্জ্বল হলদে আলোর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পূব দিকে বিস্তৃত সৈকত, পশ্চিমের সৈকত হারিয়ে গেছে অন্তরীপের আড়ালে। তখনই মনে পড়লো, পশ্চিম দিকেই মোরোর আস্তানা।

হঠাৎ একটা আগাছায় পা জড়িয়ে যেতেই ফের সেই খসখস আওয়াজটা শুনতে পেলাম। পেছন ফিরে আমি অন্ধকার-মাখা গাছগুলোর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না, অথচ মনে হচ্ছিলো যেন অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি। অস্পষ্ট অন্ধকারে প্রতিটা ছায়াকেই মনে হচ্ছিলো ভয়ঙ্কর, মনে হচ্ছিলো যেন কেউ সতর্ক ভঙ্গিমায় লক্ষ্য করছে আমাকে। প্রায় মিনিট খানেক আমি ওইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর গাছগুলোর দিকে নজর রেখে এগুতে লাগলাম পশ্চিমের দিকে। কিন্তু আমি চলা শুরু করতেই একটা ওত পেতে থাকা ছায়া তৎক্ষণাৎ আমাকে অনুসরণ করার জন্যে নড়েচড়ে উঠলো।

আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠলো। একটু এগিয়েই পশ্চিমে বিস্তৃত উপসাগরটা দেখতে পেয়ে আমি ফের থমকে দাঁড়ালাম। নিঃশব্দে ছায়াটাও আমার কাছ থেকে গজ বারো দূরে থমকে দাঁড়ালো। তারার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ধূসর বালুময় সৈকতভূমি। দূরের বাঁকটার কাছে ছোট্ট একটা আলোর ঝিলিমিলি। এখান থেকে আলোটার দূরত্ব হয়তো মাইল দুয়েক। কিন্তু ওই সৈকতে পৌঁছতে হলে আমাকে যেতে হবে গাছপালা আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে, যেখানে ওৎ পেতে রয়েছে অসংখ্য ছায়ার বিভীষিকা।

এবারে ওকে আমি আরও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বুঝলাম ওটা জন্তু নয়, কারণ ও দু পায়ে ভর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই কিছু বলার জন্যে মুখ খুললাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। ফের সচেষ্ট প্রয়াসে চিৎকার করে বললাম, 'কে ওখানে?' কোনো সাড়া এলো না। আমি এক পা এগুলাম—ও তবু নড়লো না, শুধু নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলো। পায়ে একটা পাথরে ঠোক্কর লাগতেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সামনের কালো মূর্তিটার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে আমি নিচু হয়ে পাথরের টুকরোটা হাতে তুলে নিলাম। আমার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করেই মূর্তিটা ঠিক কুকুরের মতো চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দূরের অন্ধকারের দিকে সরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল জীবনে বড়ো বড়ো কুকুরকে ভয় দেখাবার একটা কৌশল আমার মনে পড়ে গেলো। পাথরটা রুমালে জড়িয়ে

কব্জির মোচড়ে সেটা ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি করতেই দূরের ছায়াগুলোর মধ্যে দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেলাম, মনে হলো যেন কেউ ছুটে পালাচ্ছে। প্রবল উত্তেজনায় এবারে আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে ঘাম নামলো, কাঁপতে লাগলাম থরথর করে। অথচ আমার শত্রু তখন দূরে চলে গেছে, অস্ত্রটা তখনও আমার হাতে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে সৈকতের দিকে এগুতে লাগলাম। শেষ অব্দি ছুটতে ছুটতে জঙ্গল পেরিয়ে বালির ওপরে এসে নামতেই শব্দ শুনে বুঝলাম, অন্য কেউ তীব্র গতিতে আমার দিকে ছুটে আসছে। আতঙ্কে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সম্পূর্ণ গুলিয়ে গেলো, বালির ওপর দিয়েই আমি ছুটতে শুরু করলাম। আমার পেছনে তখনও সেই নরম পায়ের লঘু শব্দ। একটা আর্তচিৎকার তুলে আমি ছোটার গতি চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিলাম। খরগোশের চাইতে তিন-চার গুণ বড়ো আকারের কতকগুলো ছায়ামূর্তি ছুটতে ছুটতে কিংবা লাফাতে লাফাতে সৈকত থেকে ঝোপঝাড়-গুলোর দিকে পালিয়ে গেলো। যতোদিন বেঁচে থাকবো তাড়া খাওয়ার ওই প্রচণ্ড আতঙ্কের কথা আমি কোনোদিনও ভুলবো না। ছুটতে ছুটতে আমি তখন জলের ধারে এগিয়ে গেছি, পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারছি পেছনের প্রাণীটার সঙ্গে আমার দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। হলদে আলোটা তখনও দূরে—অনেক দূরে। চারদিকে অন্ধকার, নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি। পেছনের পায়ের শব্দটা ক্রমশ কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। ছোটাছুটি করার একেবারে অভ্যেস নেই। মনে হচ্ছিলো আমার দম ফুরিয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নেবার সময় বুকের দুধারে ছুরির খোঁচার মতো ব্যথা অনুভব করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আমি ঘেরাও চত্বরটাতে গিয়ে পৌঁছবার অনেক আগেই অনুসরণকারী আমাকে ধরে ফেলবে। মরিয়া হয়ে আমি হাঁফাতে হাঁফাতে ঘুরে দাঁড়ালাম, তারপর প্রাণীটা আমার কাছাকাছি আসতেই শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে হাতের পাথরটা তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম।

প্রাণীটা এতোক্ষণ চার হাত পায়ে ছুটছিলো। আমি ঘুরে দাঁড়াতেই সে দু পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, পাথরটা গিয়ে লাগলো তার কপালের বাঁ ধারে। জন্তু-মানুষটা উন্মাদের মতো ছুটে এসে দু হাতে ধাক্কা মেরে আমাকে পেছনের দিকে সরিয়ে দিলো, তারপর টলতে টলতে আমাকে পেরিয়ে গিয়ে জলে মুখ গুঁজে বালিতে পড়ে রইলো নিশ্চল হয়ে।

আমি কিছুতেই ওই কালো স্তূপটার দিকে এগিয়ে যেতে ভরসা পেলাম না।

চারদিকে মৃদু তরঙ্গায়িত জল আর স্থির নক্ষত্রগুলোর নিচে তাকে ফেলে রেখে অনেকটা দূর দিয়ে ঘুরে আমি সেই হলুদ আলোটার দিকে এগুতে লাগলাম। একটু বাদেই পুমাটার সেই করুণ আর্তনাদ আমাকে স্বস্তি এনে দিলো। অথচ ওই আর্তনাদই আমাকে এই রহস্যময় দ্বীপে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিলো। সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর শ্রান্তি—তবু ওই আর্তনাদটা শুনতে পেয়ে আমি প্রাণপণে নিজের সবটুকু শক্তি একত্র করে আবার ওই হলদে আলোটার দিকে ছুটতে শুরু করলাম। মনে হলো একটা কণ্ঠস্বর যেন আমার নাম ধরে ডাকছে।

মানুষের কান্না

বাড়ির কাছাকাছি হতে দেখি, আমার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে আলো আসছে। তারপরেই বাড়ির অন্য ধারের অন্ধকারের ভেতর থেকে মণ্টগোমেরির উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'প্রেনডিক—'

আমি তখনও ছুটে চলেছি। একটু বাদেই ফের মণ্টগোমেরির ডাক শুনতে পেলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম, 'এই যে!' এবং পরমুহূর্তেই টলতে টলতে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

'কোথায় ছিলেন আপনি?' হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেললেন মণ্টগোমেরি, যাতে খোলা দরজা দিয়ে আলোটা ঠিক আমার মুখে এসে পড়ে। 'আমরা দুজনেই এতো ব্যস্ত ছিলাম যে আপনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আধ ঘণ্টাটাক আগে মনে পড়লো।'

ঘরে নিয়ে গিয়ে উনি আমাকে ডেক চেয়ারটাতে বসিয়ে দিলেন। হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে খানিকক্ষণ আমি কিছু দেখতেই পেলাম না।

'আমাদের কিছু না বলে কয়েই যে আপনি এভাবে এ দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে শুরু করবেন তা আমরা ভাবতেও পারিনি। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম! কিন্তু…এ কি, কি হয়েছে আপনার…শুনছেন!'

আমার অবশিষ্ট শক্তিটুকুও তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপরে। মনে হলো আমাকে ব্র্যাণ্ডি খাওয়াবার এমন একটা সুযোগ পেয়ে মণ্টগোমেরি খুশিই হলেন। বললাম, 'ঈশ্বরের দোহাই, আপনি ওই দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

'এখানকার কিছু অদ্ভুত প্রাণীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিলো বোধহয়, তাই না ?' দরজাটা বন্ধ করে মণ্টগোমেরি ফের আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। উনি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না, তবে ফের খানিকটা ব্রাণ্ডি আর জল নিয়ে এসে আমাকে সেটুকু খেয়ে নেবার জন্যে পেড়াপেড়ি করতে লাগলেন। আমার তখন একেবারে ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। মণ্টগোমেরি অস্পষ্টভাবে বললেন, আমাকে উনি সাবধান করে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলাম এবং কি দেখেছি। সংক্ষেপে ভাঙা ভাঙা কথায় ওঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে বলুন, এ সবের অর্থ কি ?'

'তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়,' মণ্টগোমেরি বললেন। 'তবে আজ ওসব কথা থাক, একদিনের পক্ষে আপনি যথেষ্ট জেনে ফেলেছেন।'

ঠিক তখনই আচমকা নিবিড় যন্ত্রণায় পুমাটা আর্তচিৎকার করে উঠলো। মণ্টগোমেরি নিচু গলায় একটা খিস্তি দিয়ে বললেন, 'নাঃ, এ জায়গাটা গাওয়ার স্ট্রীটের মতোই জঘন্য !'

বললাম, 'মণ্টগোমেরি, যে আমাকে তাড়া করেছিলো আসলে সেটা কি ? কোনো জন্তু, না কি মানুষ ?'

'আজ রাতে না ঘুমোলে, আগামীকাল আপনি পাগল হয়ে যাবেন।'

কুর্সি থেকে উঠে আমি মণ্টগোমেরির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম, 'বলুন, কি আমাকে তাড়া করেছিলো ?'

মণ্টগোমেরি আমার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করলেন। একটু আগেই তাঁর যে চোখ দুটিকে প্রাণময় বলে মনে হচ্ছিলো, তা নিষ্প্রভ হয়ে উঠলো। বললেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা ভূত আপনার পিছু নিয়েছিলো।'

মুহূর্তের জন্যে এক প্রচণ্ড বিরক্তিতে আমার সমস্ত অনুভূতি ভরে উঠলো। দু হাতে কপালটা চেপে ধরে আমি ফের কুর্সিতে বসে পড়লাম। পুমাটা চিৎকার করতে শুরু করলো আবার।

মণ্টগোমেরি পেছন দিকে ঘুরে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, 'দেখুন প্রেনডিক, আমাদের এ দ্বীপটাতে আপনাকে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে দেবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। কিন্তু আপনার যতোটা খারাপ লাগছে, আসলে এ জায়গাটা কিন্তু ততোটা খারাপ নয়। আপনার স্নায়ুগুলো এখন একেবারে পরিশ্রান্ত। দাঁড়ান, আপনাকে আমি একটা জিনিস খাইয়ে দিচ্ছি—এতে আপনার

ঘুম আসবে···বেশ কয়েক ঘণ্টা এর রেশ থাকবে। এক্ষুনি গিয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন, নয়তো আমি আপনার কোনো কথারই জবাব দেবো না।'

আমি কিছু বললাম না, দু হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। একটু বাদেই মণ্টগোমেরি দাগ কাটা একটা ছোট্ট গ্লাসে গাঢ় রঙের খানিকটা তরল পদার্থ এনে আমার হাতে তুলে দিলেন। বিনা প্রতিবাদে আমি সেটা গিলে নিলাম। তারপর মণ্টগোমেরির সাহায্য নিয়ে এগিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম দড়ির দোলনাটাতে।

ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। খানিকক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়েই ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লক্ষ্য করলাম, কড়ি-বরগাগুলো জাহাজের কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তারপরেই মাথা ঘুরিয়ে দেখি, টেবিলে আমার খানা। এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি নামতে যেতেই দোলনাটা যেন আমার মতলব বুঝতে পেরে বিনীত ভঙ্গিমায় এক দিকে উঠে গেলো আর আমি চার হাত পায়ে আছড়ে পড়লাম ঘরের মেঝেতে।

উঠে গিয়ে খাবারের সামনে বসলাম। মাথাটা বেশ ভারি ভারি ঠেকছিলো। মনের মধ্যে গত রাত্রির ঘটনাগুলোর কিছু অস্পষ্ট স্মৃতি। জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে ভোরের মিঠে বাতাস ভেসে আসছিলো। বাতাস আর খাবার—দুয়ে মিলে দিব্যি একটা জান্তব সুখ অনুভব করছিলাম আমি। একটু বাদেই পেছনের দরজাটা খুলে গেলো। মুখ ঘুরিয়ে আমি মণ্টগোমেরিকে দেখতে পেলাম।

'ভালো আছেন তো?' উনি বললেন, 'আমি এখন ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।' তারপর ফের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। পরে আমি আবিষ্কার করেছিলাম, তখন উনি দরজাটাতে তালা লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ গতরাত্রে মণ্টগোমেরির মুখের অভিব্যক্তিটা আমার মনে পড়ে গেলো, সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেলো অন্য সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলোর কথা। আতঙ্কটা নতুন করে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এলো। কিন্তু এবারের এ আর্তনাদটা পুমার নয়।

খাওয়া বন্ধ রেখে আমি কান পেতে রইলাম। কিন্তু ভোরের বাতাসের মৃদু শিরশিরানি ছাড়া কোথাও কোনো সাড়া নেই শব্দ নেই। ভাবলাম হয়তো আমি ভুল শুনেছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ফের খেতে শুরু করলাম, কিন্তু কান দুটো তখনও উৎকর্ণ করে রাখলাম। একটু বাদেই ফের একটা অস্পষ্ট, ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি হিমস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আওয়াজটা

যদিও ক্ষীণ, কিন্তু এখন অব্দি আমি দেয়ালের ওধার থেকে যতো আওয়াজ শুনতে পেয়েছি এটার অর্থ সেগুলোর মধ্যে সব চাইতে বেশি পরিষ্কার। এই ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট ক্ষীণ শব্দের উৎস সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। আওয়াজটা গোঙানির, তীব্র যন্ত্রণায় কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এ কান্না কোনো পশুর নয়, এ কান্না যন্ত্রণাকাতর কোনো মানুষের!

কথাটা বুঝতে পেরেই আমি তিন লাফে ঘরটা পেরিয়ে এলাম, দরজার হাতলটা ধরে এক টানে খুলে ফেললাম দরজাটা।

'প্রেনডিক! আরে থামুন মশাই, থামুন!' মণ্টগোমেরি ছুটে এসে আমার পথ জুড়ে দাঁড়ালেন। চমকে উঠে একটা ডিয়ার-হাউণ্ড গর্জন করতে শুরু করলো। দেখলাম একটা গামলায় টকটকে লাল খানিকটা রক্ত। ভেতরে কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ। আধো আলো-ছায়ায় আরও দেখতে পেলাম ওধারে আরও একটা খোলা দরজা—সেখানে একটা কাঠামোর সঙ্গে কাকে যেন শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে—তার সর্বাঙ্গে কাটা-ছেঁড়ার দাগ, রক্তবর্ণ চেহারা, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তারপরেই মোরোর শরীরটা তাকে আড়াল করে দাঁড়ালো।

আমি দেখলাম, মোরোর মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে উনি রক্তমাখা একখানা হাত বাড়িয়ে আমার ঘাড়টা চেপে ধরলেন, এক মোচড়ে এমনভাবে আমাকে মেঝে থেকে তুলে ধরলেন যেন আমি একটা শিশু—তারপর অবলীলাক্রমে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার ঘরের ভেতরে। পরক্ষণেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে ওঁর মুখটা আড়াল হয়ে গেলো। তারপর শুনতে পেলাম, দরজায় চাবি ঘোরাবার আওয়াজ এবং ওঁকে শান্ত করার প্রচেষ্টায় মণ্টগোমেরির কণ্ঠস্বর।

শুনলাম মোরো বলছেন, 'আমার সমস্ত জীবনের কাজ নষ্ট হতে বসেছিলো।'

মণ্টগোমেরি বললেন, 'উনি বুঝতে পারছেন না।' তারপর আরও কিছু বললেন, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না।

'এখন আমার বোঝাবার সময় নেই,' মোরো বললেন।

বাকিটা আমি আর শুনতে পাইনি। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে। মনের মধ্যে এক ভয়াবহ সন্দেহের নিদারুণ আতঙ্ক। ভাবলাম, তবে কি মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব? বিক্ষুব্ধ আকাশের মতো ঝলসে উঠলো প্রশ্নটা। এবং তখনই আচমকা আমার মনের আবছা আতঙ্কটা এক নিদারুণ বিভীষিকার রূপ সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুললো।

বাইরের দিকের দরজাটা তখনও খোলা রয়েছে দেখে আমার মনে মুক্তি পাবার এক অযৌক্তিক আশা জেগে উঠলো। এখন আমি নিশ্চিত—একেবারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে মোরো একজন মানুষকেই ব্যবচ্ছেদ করছিলেন। ওঁর নামটা শোনার পর থেকেই আমি মনে মনে ওঁর গবেষণার জঘন্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই দ্বীপের জানোয়ারসুলভ অধিবাসীদের একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলাম। মনে হলো এবারে ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে যে প্রাণী-গুলোকে আমি দেখেছি তারা মোরোরই ভয়াবহ পরীক্ষার শিকার।

আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যেই ওই শয়তান দুটো আমাকে এখানে পুষে রাখতে চেয়েছে, আস্থার ভাব দেখিয়ে আমাকে বোকা করতে চেয়েছে। মৃত্যুর চাইতেও ভয়াবহ এক নিয়তি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। নির্মম যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে আমাকে। তারপর সেই অত্যাচারের পরে যতোটা বিকৃতির কথা কল্পনা করা যায়, তেমনি একটা বীভৎস আকৃতি দিয়ে আমাকে ওরা দ্বীপের অন্যান্য প্রাণী-গুলোর কাছে পাঠিয়ে দেবে।

যা হোক একটা অস্ত্র সংগ্রহের আশায় আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই নেই। এক আকস্মিক প্রেরণায় আমি ডেক-চেয়ারটাকে উলটে ফেলে, পায়ের চাপ দিয়ে পাশের দিককার একটা কাঠ ভেঙে নিলাম। দেখলাম কাঠটার সঙ্গে একটা পেরেকও উঠে এসেছে। ফলে এই আপাত নিরীহ অস্ত্রটাও মোটা-মুটি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ শুনে চট করে দরজাটা খুলে দিতেই দেখি, গজখানেক দূরে মণ্টগোমেরি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর উদ্দেশ্য ছিলো, দরজাটাতে তালা লাগিয়ে দেওয়া। পেরেক লাগানো কাঠের টুকরোটা উঁচু করে তুলে ধরে আমি সেটা ওঁর মুখের দিকে নামিয়ে আনলাম। কিন্তু উনি এক লাফে পেছিয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আমি এবারে বাড়িটার কোণের দিকে ছুটে গেলাম।

'প্রেনডিক!' শুনতে পেলাম মণ্টগোমেরি বিস্মিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছেন, 'আরে এমন বোকামো করছেন কেন? ও মশাই!'

ভাবলাম, আর একটা মিনিট দেরি হলেই লোকটা আমাকে তালা লাগিয়ে ঘরে বন্দী করে ফেলতো—তারপর হাসপাতালে গবেষণার খরগোশের মতোই অবস্থা হতো আমার।

ততোক্ষণে মণ্টগোমেরিও কোণের দিকে চলে এসেছেন। শুনতে পেলাম উনি চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছেন। তারপর উনি আমার পেছন পেছন ছুটতে শুরু করলেন এবং ছুটতে ছুটতেই চিৎকার করে কি যেন বলতে লাগলেন আমাকে।

এবারে আমি অন্ধের মতো উত্তর-পূব দিকে ছুটছিলাম। ছুটতে ছুটতেই একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি, মণ্টগোমেরির সঙ্গে তাঁর সেই পরিচারকটিও রয়েছে। হিংস্র পায়ে উৎরাই পেরিয়ে পুব দিকে মোড় ঘুরে, আমি একটা পাথুরে উপত্যকা ধরে ছুটে চললাম। উপত্যকার দু ধারে ঘন জঙ্গল। সব মিলিয়ে বোধহয় মাইল খানেক ছুটেছিলাম। ক্লান্তিতে আমার বুকটা তখন টনটন করছে, নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছি হৃৎপিণ্ডের ঢিপঢিপ আওয়াজ। কিন্তু মণ্টগোমেরি বা তাঁর চাকরটার কোনো সাড়া না পেয়ে এবং ক্লান্তিতে আমি প্রায় ভেঙে পড়েছি বুঝতে পেরে, চকিতে গতিবেগ দ্বিগুণ করে আমি অনুমানে সৈকতের দিকে ছুটতে লাগলাম। তারপর একটা বেত-ঝোপের আশ্রয়ে শুয়ে পড়লাম শরীর বিছিয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ আমি ওখানেই পড়ে রইলাম। নড়াচড়া করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু করার কথা ভাবতেও আমার ভয় করছিলো। আমার চারদিকে উদাস বন্য-প্রকৃতি রোদ্দুরে শরীর এলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। একমাত্র আওয়াজ বলতে ছোটোছোটো একরাশ ডাঁশ মাছির মৃদু গুঞ্জন—যারা আচমকা আমাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। একটু বাদেই আমি একটা ঘুম-ঘুম শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম—কিন্তু আসলে সেটা সৈকতের বুকে সমুদ্রের আছড়ে পড়ার শিস।

ঘণ্টাখানেক বাদে শুনতে পেলাম, মণ্টগোমেরি উত্তর দিকে অনেক দূর থেকে চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছেন। ডাকটা শুনেই আমি নতুন করে নিজের পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতে শুরু করলাম। ভেবে দেখলাম, এই দ্বীপে অধিবাসী বলতে ওই দুটি মাত্র ব্যবচ্ছেদকারী আর তাদের সৃষ্ট কতকগুলো পশু-মানুষ। প্রয়োজন হলে ওদের মধ্যে কয়েকজনকে ওঁরা দুজনে নিঃসন্দেহে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারেন। আমি জানি, মোরো এবং মণ্টগোমেরি দুজনের

কাছেই রিভলভার আছে। আর আমার কাছে আছে ছোট্ট একটা পেরেক তোলা একটুকরো কমজোরি কাঠ—যা অস্ত্রের নামে স্রেফ একটা পরিহাস—কিন্তু তা ছাড়া আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। অতএব যেখানে ছিলাম, আমি সেখানেই চুপ করে পড়ে রইলাম। কিন্তু খাদ্য আর পানীয়ের কথা মনে হতেই নিজের প্রকৃত অসহায় অবস্থাটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এখানে খাদ্য সংগ্রহ করার কোনো উপায় আমার নেই। উদ্ভিদবিদ্যায় আমি এতোই অজ্ঞ যে কোন্ কোন্ গাছের ফলমূল আমার কাজে লাগবে তা খুঁজে নিতে আমি অক্ষম। দ্বীপের কয়েকটা খরগোশকে ফাঁদ পেতে ধরবো, সে উপায়ও আমার নেই। যতোই চিন্তা করতে লাগলাম, পরিস্থিতিটা আমার কাছে ততোই হতাশাজনক হয়ে উঠতে লাগলো।

অবশেষে মরিয়া হয়ে আমি আমার দেখা পশু-মানুষগুলোর কথা চিন্তা করতে লাগলাম—ভেবে দেখার চেষ্টা করলাম ওদের কারুর কাছ থেকে আমার সাহায্য পাবার কোনো আশা আছে কি না। কিন্তু তারপরেই আচমকা একটা স্ট্যাগ হাউণ্ডের চিৎকার শুনে আমি একটা নতুন বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। বেশিক্ষণ চিন্তা করার সময় নেই, কারণ তাহলেই ওরা আমাকে ধরে ফেলবে। পেরেক তোলা লাঠিটা চেপে ধরে, আমি আমার গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণপণে সমুদ্রের শব্দ লক্ষ্য করে ছুট লাগালাম। মনে আছে গাছের কাঁটা আমার সর্বাঙ্গে তখন ছুরির মতো বিঁধছিলো। রক্তাক্ত শরীর আর ছিন্নভিন্ন পোশাকে আমি উত্তরমুখো লম্বা খাঁড়িটার কাছে গিয়ে পৌছলাম। তারপর এক মিনিট সামান্য ইতস্তত করে ছোট্ট নদীটার হাঁটু জল পেরিয়ে পশ্চিম তীরে গিয়ে উঠলাম। গুঁড়ি মেরে একরাশ ফার্ণের জটলার মধ্যে গিয়ে ঢুকতেই দূর থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম—কাঁটা গাছগুলোর কাছে এসে চিৎকার করছে কুকুরটা। তারপর সব চুপচাপ। ভাবলাম, তাহলে এ যাত্রায় বোধহয় রেহাই পেয়ে গেলাম।

ক্রমে মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগলো, স্তব্ধতা দীর্ঘতর হলো এবং অবশেষে ঘণ্টাখানেক নিরাপদে কাটাবার পর আমি আবার সাহস ফিরে পেতে শুরু করলাম।

এতোক্ষণে আমার মনে প্রচণ্ড ভয় বা হতাশার ভাবটা কেটে গেছে। কারণ ইতিমধ্যেই আমি আতঙ্ক আর হতাশার সীমাটা পেরিয়ে এসেছি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে এখন আমি যে কোনো দুঃসাহসী কাজের জন্যে প্রস্তুত। এমন কি ইচ্ছে হচ্ছে, ফিরে গিয়ে মোরোর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াই। জল পেরিয়ে আসার সময় আমার মনে হচ্ছিলো, তেমন মুশকিলে পড়লে অত্যাচার এড়াবার একটা পথ আমার

কাছে খোলাই রয়েছে—আমার জলে ডুবে মরাটা তো ওরা আটকাতে পারবে না! তখনই ইচ্ছে হচ্ছিলো ডুবে মরি—কিন্তু এই পুরো ঘটনাটার শেষ দেখার একটা অদ্ভুত বাসনা আর নিজের সম্পর্কে এক বিচিত্র নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহ আমাকে তা করতে দেয়নি। কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে আমি চতুর্দিকের গাছপালাগুলোর দিকে চোখ মেলে রাখলাম। তারপরেই হঠাৎ দেখি, সবুজের ভেতর থেকে একটা কালো মুখ আমাকে লক্ষ্য করছে।

দেখে বুঝলাম, মোরোর লঞ্চটা যখন দ্বীপের দিকে আসে তখন এই প্রাণীটাই সৈকতে দাঁড়িয়েছিলো। এখন একটা হেলে পড়া পাম গাছের গুঁড়ি ধরে ঝুলছে প্রাণীটা। হাতের লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরে আমি ওর মুখোমুখি হতেই প্রাণীটা কিচিরমিচির করে কি যেন বলতে শুরু করলো। প্রথমটাতে 'তুমি, তুমি, তুমি' ছাড়া, ওর কথার আর একটি বর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ ও ঝুপ করে মাটিতে নেমে পড়লো, পরক্ষণেই দেখি লতাপাতার ফাঁক দিয়ে প্রাণীটা কৌতূহলী চোখে লক্ষ্য করছে আমাকে।

এ দ্বীপের অন্যান্য পশু-মানুষদের দেখে আমার যেমন গা ঘিনঘিন করেছে, এ লোকটাকে দেখে কিন্তু তেমন কিছু হলো না। 'তুমি···নৌকোয়—' বললো ও। তাহলে ও মানুষ—অন্তত মণ্টগোমেরির চাকরটার মতো মানুষ—কারণ ও কথা বলতে পারে!

বললাম, 'হ্যাঁ, আমি নৌকোয় এসেছি। জাহাজ থেকে।'

'ও!' প্রাণীটার উজ্জ্বল চঞ্চল চোখ দুটো ঘুরে ঘুরে আমার সর্বাঙ্গ, আমার হাত, হাতের লাঠি, পা, কোটের ছেঁড়াখোঁড়া জায়গাগুলো, সর্বাঙ্গে কাঁটার আঘাত—সবকিছু লক্ষ্য করলো। মনে হলো, কি একটা দেখে ও একেবারে অবাক হয়ে গেছে। ওর দৃষ্টি আবার আমার হাতের দিকে ফিরে এলো। তারপর নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ও আস্তে আস্তে আঙুলগুলো গুনতে লাগলো, 'এক দুই তিন চার পাঁচ—অ্যাঁ?'

তখন আমি ওর কথার অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে দেখেছি এই পশু-মানুষদের মধ্যে একটা বিরাট অংশেরই হাতগুলো বিকৃত, এমন কি অনেকের হাতে তিনটে আঙুলও নেই। কিন্তু তখন এটাকে এক ধরনের প্রীতি-সম্ভাষণ মনে করে আমিও জবাবে ঠিক তাই করলাম। প্রাণীটা পরম তৃপ্তিতে হাসলো। তারপর চকিত দৃষ্টিতে একবার চারদিকে তাকিয়ে আচমকা উধাও

হয়ে গেলো—ফার্নের যে ফাঁকটাতে সে দাঁড়িয়েছিলো, সেটা আবার আড়াল হয়ে গেলো।

ঝোপঝাড় সরিয়ে আমিও ওকে অনুসরণ করলাম। তারপরেই অবাক হয়ে দেখলাম, একটা লম্বা গাছের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একগুচ্ছ লতাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে প্রাণীটা আমার দিকে পেছন করে মনের আনন্দে দোল খাচ্ছে।

'ওহে!' আমি ওকে ডাকলাম।

একটা ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে নেমে এসে প্রাণীটা আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো।

'বলছি কি, কোথায় খাবার পাবো বলো তো?'

'খাবার? এখন মানুষের খাবার খাও।' প্রাণীটার দৃষ্টি দুলতে থাকা লতা-গুচ্ছের দিকে ফিরে গেলো। 'কুটিরে আছে।'

'কিন্তু কুটির কোথায়?'

'অ্যাঁ!'

'জানোই তো, আমি নতুন লোক।'

কথাটা শুনেই প্রাণীটা ঘুরে গিয়ে দ্রুত পা চালালো। বললো, 'এসো।' ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখার জন্যে আমিও ওর পিছু নিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম, কুটির বলতে হয়তো কতকগুলো ছাউনি—যেখানে ওই প্রাণীটা এবং ওর মতো আরও কয়েকজন পশু-মানুষ বাস করে। হয়তো ওরা আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবে, হয়তো আমি ওদের মনের কোণে একটু ঠাঁই করে নেবার সুযোগ পাবো—অবিশ্যি জানি না মানুষ-জীবনের কোমল অনুভূতির কতোটা এখনও ওদের মনে অবশিষ্ট আছে।

আমার বনমানুষের মতো সঙ্গীটি লাফাতে লাফতে আমার পাশে পাশে হাঁটছে, হাত দুটো ঝুলছে ওর শরীরের দু ধারে, চোয়ালটা এগিয়ে রয়েছে সামনের দিকে। ভাবছিলাম মানুষ জীবনের কতোটা স্মৃতি ওর এখনও মনে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কদ্দিন এ দ্বীপে আছো?'

'কদ্দিন?' পালটা প্রশ্ন করে ও তিনটে আঙুল তুলে ধরলো। তার মানে প্রাণীটা নেহাত নির্বোধ নয়। আমি বুঝতে চাইছিলাম ও কি বলতে চাইছে, কিন্তু দেখলাম ও তাতে বিরক্ত হচ্ছে। আরও দু-একটা প্রশ্নের পর ও হঠাৎ আমার পাশ থেকে সরে গিয়ে এক লাফে একটা গাছ থেকে ঝুলতে থাকা একমুঠো ফল পেড়ে আনলো, তারপর খোসা ছাড়িয়ে মনের আনন্দে খেতে লাগলো সেগুলোকে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আমি খুশিই হলাম। কারণ শেষ অব্দি অন্তত একটা খাদ্য-বস্তুর সন্ধান তো পাওয়া গেলো! ওকে আমি আরও গোটা কয়েক প্রশ্ন করলাম। কিন্তু ও সঙ্গে সঙ্গেই কিচিরমিচির করে যে সমস্ত জবাব দিলো তার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার প্রশ্নের কোনো সঙ্গতি নেই। সামান্য কয়েকটার দিব্যি যুতসই জবাব, বাকিগুলো অর্থহীন।

প্রাণীটার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আমি এতো মন দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম যে কোন্ পথ ধরে আমরা চলেছি তা ভালো করে খেয়ালই করিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা যে জায়গাটাতে গিয়ে হাজির হলাম সেখানকার সমস্ত গাছগুলোই বাদামি অথবা অঙ্গারের মতো কালো। তারপর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানকার মাটিতে একটা হলদে-সাদা আস্তরণ, তার ওপর দিয়ে হালকা ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে। চোখ আর নাকে এক ঝলক বাতাস এসে লাগতেই বুঝলাম ধোঁয়াটা বেশ ঝাঁঝালো। আমাদের ডান দিকে একটা নগ্ন টিলার ওধারেই সমুদ্র। পথটা আচমকা বাঁক নিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ গিরিখাতে গিয়ে পৌঁছেছে। তার দু ধারে জমাট-বাঁধা কালচে লাভার দেয়াল। আমরা সেই গিরিখাতে গিয়ে ঢুকলাম।

বাইরে গন্ধকের আস্তরণে ঠিকরে ওঠা সূর্যের চোখ ধাঁধানো আলোর পরে ভেতরটাতে বেশ অন্ধকার। দু ধারের দেয়াল খাড়াই ভাবে ওপরের দিকে উঠে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার চোখের সামনে দিয়ে বিন্দু বিন্দু লাল আর সবুজের ছোপ ভেসে গেলো। হঠাৎ আমার পথপ্রদর্শকটি থমকে দাঁড়িয়ে বললো, 'বাড়ি!' চোখে অন্ধকারটা সয়ে যেতেই দেখি আমি একটা খাদের মেঝেতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। জায়গাটাতে কেমন যেন বোটকা গন্ধ—বানরের নোংরা খাঁচায় যেমন দুর্গন্ধ হয়, ঠিক তেমনি ওধারের খোলা পথটা ঢাল বেয়ে নিচের রোদ-ঝলমলে সবুজ গাছগাছালির দিকে নেমে গেছে আর দুদিক থেকে আলোর ছুটো সূক্ষ্ম ধারা এসে লুটিয়ে পড়েছে মাঝখানকার অন্ধকারের বুকে।

আইন-শিক্ষক

হঠাৎ হাতে কিসের একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগতেই আমি ভীষণ চমকে উঠে দেখি, আমার একেবারে কাছাকাছি একটা হালকা-লালচে-রঙের প্রাণী—দেখতে অনেকটাই সদ্য-ছাল-ছাড়ানো শিশুর মতো। প্রাণীটার ঠিক শ্লথের মতোই বিশ্রী

চেহারা, তেমনি চাপা কপাল আর ঢিলেঢালা অঙ্গভঙ্গি। আলো-পরিবর্তনের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর চতুর্দিকের পরিবেশ ক্রমশ আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। দেখলাম শ্লথের মতো আকৃতির ছোট্ট প্রাণীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। আমার পথপ্রদর্শকটি উধাও।

দু ধারে জমাট বাঁধা লাভার উঁচু দেয়ালের মাঝখানে এ জায়গাটা একটা খাদের মতো সরু গলিপথ। পথের দু ধারে পাহাড়ের গায়ে হেলে পড়া রাশি রাশি বুনো আগাছা আর ঝোপ-জঙ্গল এখানে-সেখানে অজস্র দুর্ভেদ্য অন্ধকার গুহা গড়ে তুলেছে। আঁকাবাঁকা এই গলিপথটার বিস্তার বড়োজোর তিন গজ। রাশীকৃত পচে ওঠা ফলের ছিবড়ে আর অন্যান্য আবর্জনা মিলে জায়গাটাকে এমন দুর্গন্ধময় করে তুলেছে!

হঠাৎ আমার সঙ্গী সেই বনমানুষটা যেন কোত্থেকে সবচাইতে কাছের গুহাটার মুখের কাছে এসে হাজির হয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। শ্লথের মতো চেহারার সেই ছোট্ট গোলাপী প্রাণীটা তখনও চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমন সময় বিশাল দানবের মতো একটা ছায়ামূর্তি হেলতে-দুলতে এগিয়ে এসে আমার পথ জুড়ে দাঁড়ালো। আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলাম। একবার মনে হলো, যে দিক দিয়ে এখানে এসে ঢুকেছি সে দিকেই ছুটে পালাই। তারপর স্থির করলাম, এ অভিযানের শেষটা আমাকে দেখতেই হবে। তাই আমার পেরেক-তোলা লাঠিটাকে চেপে ধরে সেই দুর্গন্ধময় গলিপথ দিয়ে গুঁড়ি মেরে আমার পথপ্রদর্শকটির দিকে এগিয়ে গেলাম।

জায়গাটা অর্ধবৃত্তাকার, ঠিক যেন মৌচাকের আধখানা। ভেতরের দেয়ালের কাছে নানা ধরনের স্তূপাকার ফলমূল আর নারকেল। মেঝেতে লাভা আর কাঠের তৈরি কয়েকটা পাত্র আর একটা টুল। কোথাও আগুন নেই। আমি ভেতরে গিয়ে ঢুকতেই কুটিরের সবচাইতে অন্ধকার কোণে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতো বসে থাকা একটা ছায়ামূর্তি গর্জন করে উঠলো, 'অ্যাই!' আমার সঙ্গী বানর-মানুষটা প্রবেশপথের আধো-আলোয় দাঁড়িয়ে একটুকরো নারকেল আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ তখন কাঁপছে, প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে গুহার অপরিসর পরিবেশ। তবু উবু হয়ে বসে যথাসম্ভব শান্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে আমি নারকেলটা চিবোতে লাগলাম। ছোট্ট গোলাপী-শ্লথটা তখন কুটিরের প্রবেশ-পথের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কদর্য মুখের কি একটা প্রাণী যেন ঘাড় ফিরিয়ে জুলজুলে দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে আমাকে।

'অ্যাই,' আমার উলটো দিক থেকে রহস্যময় ছায়ামূর্তিটা ফের বলে উঠলো।

'ও একটা মানুষ! ও একটা মানুষ!' আমার পথপ্রদর্শক আধো আধো বুলিতে বলতে লাগলো, 'মানুষ, মানুষ, জ্যান্ত মানুষ—আমার মতো।'

'চোপ!' অন্ধকার থেকে কণ্ঠস্বরটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো।

নিবিড় নৈঃশব্দের মধ্যে আমি তখনও নারকেল চিবোচ্ছি। প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অন্ধকারের মধ্যে কিছুই আলাদা করে বুঝতে পারছি না।

'ও একটা মানুষ,' কণ্ঠস্বরটা ফের বললো। 'ও কি আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছে?'

যে জিনিসটা আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হলো তা হচ্ছে, কণ্ঠস্বরটা গম্ভীর হলেও তার মধ্যে কি যেন একটা রয়েছে—কেমন যেন একটা উঁচু শিসের মতো আভাস। তবে ইংরেজী উচ্চারণ কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর।

বানর-মানুষ আমার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে যেন আমি কিছু বলবো বলে সে আশা করছে। বুঝতে পারলাম, বিরতিটা প্রশ্নবাচক। তাই বললাম, 'তোমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছে।'

'ও একটা মানুষ। ওকে আইন শিখতে হবে।'

ততোক্ষণে আমি অন্ধকারের ভেতরে আরও অন্ধকার একটা কালো স্তূপকে আলাদা করে বুঝতে পেরেছি, দেখতে পেয়েছি কুঁজো হয়ে থাকা ছায়ামূর্তির অস্পষ্ট দেহরেখা। তারপর লক্ষ্য করলাম, কুটিরের প্রবেশপথটা আরও দুটো প্রাণীর উপস্থিতিতে আবছা হয়ে উঠেছে। আমার হাত শক্ত মুঠিতে লাঠিটাকে চেপে ধরলো। অন্ধকারের ভেতর থেকে কণ্ঠস্বরটা এবারে জোরে জোরে বললো, 'কথা-গুলো বলো।' আমি ওর শেষ কথাটা খেয়াল করে শুনিনি। সে গান গাইবার মতো সুরেলা ভঙ্গিতে কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলো, 'চার-পায়েতে হাঁটা নয়—তাই তো আইন—'

আমি তখন হতবিহ্বল হয়ে উঠেছি। বানর-মানুষ বললো, 'কথাগুলো বলো।' প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য প্রাণীগুলোও শাসানোর সুরে তার কথার প্রতিধ্বনি তুললো। বুঝলাম, আমাকেও ওই অর্থহীন সূত্রগুলো পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তারপরে যা শুরু হলো তা এক চূড়ান্ত উন্মাদ-উৎসব। অন্ধকারের ভেতর থেকে কণ্ঠস্বরটা প্রার্থনা-গানের ভঙ্গিতে একটা করে পংক্তি সুর করে গাইতে থাকে, আমি আর বাদবাকি সবাই তার পুনরাবৃত্তি করি। গাইতে গাইতে সকলে এধার থেকে ওধারে হেলে দুলে হাঁটুতে হাত ঠুকে তাল দেয়, আমিও ওদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি। মনে হয়, আমি বুঝি মরে গিয়ে অন্য এক পৃথিবীতে এসে হাজির

হয়েছি। অন্ধকার কুটির…এখানে-সেখানে আলোর আভা লেগে মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছায়ামূর্তিগুলোর আবছা শরীর…আর সবাই মিলে একসঙ্গে হেলে দুলে সুর করে বলে চলেছে :

'চার-পায়েতে হাঁটা নয়, তাই তো আইন—
আমরা কি মানুষ নই ?
জল শুষে খাওয়া নয়, তাই তো আইন—
আমরা কি মানুষ নই ?
মাছ মাংস খাওয়া নয়, তাই তো আইন—
আমরা কি মানুষ নই ?
গাছেতে নখ আঁচড়ানো নয়, তাই তো আইন—
আমরা কি মানুষ নই ?
অন্য মানুষকে তাড়া নয়, তাই তো আইন—
আমরা কি মানুষ নই ?'

এইভাবে ক্রমাগত অন্যায় কার্যাবলীর বিরুদ্ধে অজস্র নিষেধাজ্ঞা আবৃত্তি করা হলো। আমার শুধু মনে হচ্ছিলো—এর চাইতে পাগলামি, এমন অসম্ভব, এর চাইতে জঘন্য কাণ্ডকারখানা আর কিছু কল্পনা করা যায় না। এক ধরনের ছন্দের উদ্দীপনা আমাদের সবাইকে পেয়ে বসেছিলো। আমরা ক্রমাগত আরও জোরে জোরে দুলছি আর ওই অদ্ভুত আইনগুলো আবৃত্তি করছি। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে আমার ওপরেও ওই পশু-মানুষগুলোর প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আমার ভেতরে ভেতরে তখন হাসি আর বিরক্তির প্রচণ্ড লড়াই চলেছে।

নিষেধাজ্ঞার এক বিরাট তালিকা শেষ করে আমরা এক নতুন সূত্রের গান ধরলাম :

'যন্ত্রণার ওই ঘর—সে যে তাঁর,
সৃষ্টির ওই হাত—সেও তাঁর,
আঘাত দেবার হাত—সে যে তাঁর,
আরাম দেবার হাত—সেও তাঁর।'

এবং এই ভাবে চললো আরও এক দীর্ঘ তালিকা—সবই 'তাঁর' সম্পর্কে। কিন্তু 'তিনি' যে মহাজনই হোন না কেন, আমার কাছে এর সমস্ত কিছুই বোধের অতীত এক অর্থহীন প্রলাপ। হয়তো ধরে নিতে পারতাম, এটা একটা স্বপ্ন। কিন্তু এর আগে আমি কোনোদিনও স্বপ্নে প্রার্থনা-গান শুনিনি। আমরা গাইলাম :

'বজ্রের ওই আলো—সে যে তাঁর,
গভীর লোনা সাগর—সেও তাঁর।'

হঠাৎ একটা সাংঘাতিক চিন্তা আমার মাথায় এলো। মনে হলো, এই মানুষগুলোকে পশু বানাবার পর মোরোই ওদের স্বল্পায়িত মস্তিষ্কে এই সমস্ত ধারণাগুলোকে চাপিয়ে দিয়েছেন, ওদের কাছে নিজেকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু তবু ঝকঝকে সাদা দাঁত আর বলিষ্ঠ থাবাগুলোর সম্পর্কে প্রচণ্ড সচেতন থাকায় আমি গান থামালাম না। আমরা গাইলাম, 'আকাশের ওই তারা—সে যে তাঁর।'

অবশেষে গান শেষ হলো। দেখলাম, বানর-মানুষের মুখটা ঘামে চকচক করছে। ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি অন্ধকারে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অন্ধকার কোণের দিকে তাকিয়ে আমি সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। দেখলাম, আকারে মানুষের মতো হলেও তার সর্বাঙ্গ হালকা ধূসর রঙের রোমে ঢাকা—অনেকটাই স্কটল্যাণ্ডের শিকারী কুকুর স্কাই টেরিয়ারের মতো। এটা কি? এরা সমস্ত কারা? ভেবে দেখুন, আপনারা যতোটা কল্পনা করতে পারেন ততোটা ভয়ঙ্কর সমস্ত বিকলাঙ্গ বিকৃত অর্ধ উন্মাদের দল আপনাদের ঘিরে রেখেছে—তাহলে হয়তো মনুষ্যত্বের মূর্তিমান পরিহাসস্বরূপ এই প্রাণীগুলোর মাঝখানে বসে থাকা অবস্থায় আমার মানসিক পরিস্থিতির সামান্য খানিকটা আপনারা বুঝতে পারবেন।

'ও পাঁচ-আঙুলে, পাঁচ-আঙুলে, পাঁচ-আঙুলে…আমার মতো,' বানর-মানুষ বললো।

আমি নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম। অন্ধকার কোণের ধূসর প্রাণীটা সামনের দিকে ঝুঁকে বললো, 'চার-পায়েতে হাঁটা নয়, তাইতো আইন—আমরা কি মানুষ নই?' তারপর সে তার অদ্ভুত বিকৃত হাতটা বাড়িয়ে আমার আঙুলগুলো চেপে ধরলো। দেখে মনে হলো, একটা হরিণের খুরকে কেটেকুটে কোনো রকমে একটা থাবা করা হয়েছে। বিস্ময় আর যন্ত্রণায় আমি হয়তো চিৎকারই করে উঠতাম। কিন্তু প্রাণীটা তার মুখখানা সামনের দিকে এগিয়ে এনে আমার নখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো, তারপর এগিয়ে গেলো প্রবেশপথের আলোর দিকে। চরম বিতৃষ্ণায় আমি লক্ষ্য করলাম, ওর মুখটা মানুষের মতো নয়—কোনো জন্তুর মতোও নয়…শুধু একরাশ ধূসর রোম আর তার মধ্যে ছায়া ছায়া তিনটে উঁচু মতো জায়গা—সেখানে ওর চোখ আর মুখ।

'ওর নখ ছোটো। বেশ ভালো,' ধূসর প্রাণীটা আমার হাতটাকে ছুঁড়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি সহজাত প্রবৃত্তিবশেই আমার লাঠিটাকে শক্ত করে চেপে ধরলাম।

'ফলমূল—লতাপাতা খাও, সেটাই তাঁর ইচ্ছে,' বানর-মানুষ বললো।

'আমি আইনের বক্তা,' ধূসর প্রাণীটা বললো। 'নতুনরা সবাই এখানে আইন শিখতে আসে। আমি অন্ধকারে বসে থাকি আর আইন বলি।'

'ঠিক তাই,' প্রবেশপথের কাছ থেকে একটা প্রাণী বললো।

'যারা আইন ভাঙে, তারা কঠিন শাস্তি পায়। কেউ রক্ষা পায় না।'

সবাই চোরা-দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো, 'কেউ রক্ষা পায় না।'

'কেউ না, কেউ না,' বানর-মানুষ বলতে থাকে, 'কেউ রক্ষা পায় না। ছাখো না, আমি ছোটোখাটো একটা কাজ করে ফেলেছিলাম—খারাপ কাজ—মোটে একবার! বিড়বিড় করে কথা বলতাম, কথা বলতাম—তারপর কথা বলা বন্ধ করে দিলাম। কেউ বুঝতে পারেনি। কিন্তু আমি পুড়ে গেলাম, হাতে দাগ হয়ে গেলো! তিনি মহান, তিনি ভালো!'

'কেউ রক্ষা পায় না,' কোণের দিক থেকে ধূসর প্রাণীটা বলে।

'কেউ রক্ষা পায় না,' পশু-মানুষরা তির্যক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়।

'কারুরই অন্যায় করতে চাওয়া উচিত নয়,' আইন-বক্তা বলতে থাকে, 'তুমি কি চাইবে, আমরা জানি না। কিন্তু জানবো। যারা নড়েচড়ে বেড়ায় কেউ কেউ তাদের পিছু নিতে চায়, চোরের মতো পিছু নিয়ে সুযোগ বুঝে লাফিয়ে পড়ে তাদের কামড়াতে চায়, মেরে ফেলতে চায়, প্রাণ ভরে রক্ত শুষে খেতে চায়—এটা খারাপ। অন্য মানুষকে তাড়া নয়, তাই তো আইন—আমরা কি মানুষ নই? মাছ-মাংস খাওয়া নয়, তাই তো আইন—আমরা কি মানুষ নই?'

'কেউ রক্ষা পায় না,' প্রবেশপথের কাছ থেকে গায়ে চাকা-চাকা দাগওলা একটা পশু বলে ওঠে।

'প্রত্যেকের পক্ষেই অন্যায় করতে চাওয়াটা খারাপ,' আইনরক্ষক ফের বলতে শুরু করে। 'কেউ কেউ দাঁত দিয়ে হাত দিয়ে গাছের মূল ছিঁড়তে চায়, কেউ কেউ মাটি শোঁকে—এসব অন্যায়।'

'কেউ রক্ষা পায় না—'

'কেউ কেউ গাছে নখ আঁচড়াতে যায়, কেউ কেউ মৃতের কবর খুঁড়তে চায়, কেউ কেউ কপাল দিয়ে, পা দিয়ে বা থাবা দিয়ে লড়াই করে, কেউ হঠাৎ করে বিনা কারণে কামড়ে দেয়, আবার কেউ কেউ নোংরামো ভালোবাসে।'

'কেউ রক্ষা পায় না,' বানর-মানুষ পায়ের গুলি চুলকোতে চুলকোতে বলে।

'কেউ রক্ষা পায় না,' ছোট্ট শ্লথটাও পুনরাবৃত্তি করে।

'শাস্তি হবেই, কঠিন শাস্তি। অতএব আইন শেখো। বলো…'

ফের সে সুর করে সেই অদ্ভুত আইন বলতে শুরু করলো এবং অন্যদের সঙ্গে আমিও তেমনি হেলে দুলে সেই গান গাইতে লাগলাম। ওই আবোলতাবোল চিৎকার আর দুর্গন্ধে আমার তখন মাথা ঘুরছে। তবু শীগগিরি নতুন কোনো সুযোগ আসবে ভেবে আমিও বলে চললাম, 'চার-পায়েতে হাঁটা নয়, তাই তো আইন—আমরা কি মানুষ নই?'

আমরা এতো হুল্লোড় করছিলাম যে বাইরের কোনো গোলমালই আমার কানে আসেনি। হঠাৎ দেখি একজন—আমি যে দুজন শুয়োর-মানুষকে দেখেছিলাম সম্ভবত তাদের মধ্যেই একজন—শ্লথটার মাথার ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশপথের কাছটা ফাঁকা হয়ে গেলো, বানর-মানুষটা ছুটতে ছুটতে তাদের অনুসরণ করলো, তার পেছনে অন্ধকার কোণে বসে থাকা সেই প্রাণীটাও। দেখলাম প্রাণীটার বিশাল চেহারা, সর্বাঙ্গ রুপোলি রোমে ঢাকা। ভেতরে তখন আমি একা।

আমি প্রবেশপথের কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই দূর থেকে স্ট্যাগ হাউণ্ডের চিৎকার শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তেই আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, আমার হাতে কুমির সেই কাঠখানা, শরীরের সমস্ত পেশীগুলো উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে। আমার সামনে একগাদা পশু-মানুষ আমার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঁধের আড়ালে ওদের মাথাগুলো প্রায় নজরেই আসে না। ওদের হাবভাবে চরম উত্তেজনা। অর্ধেক পশুর মতো কয়েকটা মুখ জ্বলন্ত অনুসন্ধিৎসু চোখে তাদের গুহা থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে গলিপথের অন্য প্রান্তের দিকে তাকিয়ে আমি গাছপালার আড়ালের ভেতর থেকেও মোরো এবং তাঁর ভয়ঙ্কর পাণ্ডুর মুখখানা দেখতে পেলাম। লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা স্ট্যাগ হাউণ্ডটাকে তিনি শেকল টেনে সামলে রাখছেন। তাঁর ঠিক পেছনেই মণ্টগোমেরি, হাতে রিভলবার।

মুহূর্তের জন্যে আমি আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি, পুরো পথটা জুড়ে একটা বিশাল প্রাণী আমার দিকে এগিয়ে আসছে—প্রকাণ্ড ধূসর মুখে জ্বলজ্বল করছে তার খুদে খুদে চোখ দুটো। ডান দিকে ফিরে দেখি, আমার কাছ থেকে গজ ছয়েক দূরে পাথুরে দেয়ালটার একটা সঙ্কীর্ণ ফাটল দিয়ে আলোর

রেখা তির্যক ভঙ্গিতে নিচের ছায়ায় এসে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি সেদিকে পা বাড়াতেই মোরো চিৎকার করে উঠলেন, 'দাঁড়ান!' তারপর বললেন, 'ধরো ওঁকে!'

প্রথমে একজন, তারপর অন্যেরা আমার দিকে ঘুরে তাকালো। ওদের পশু-সুলভ মনগুলো ধীরে ধীরে কাজ করে দেখে আমি খুশি হলাম। মোরো কি বলতে চাইছেন তা বোঝার জন্যে সামনের দানবটা ওঁর দিকে তাকাতেই আমি কাঁধের এক ধাক্কায় তাকে অন্য একটার ঘাড়ে ঠেলে ফেলে দিলাম। হাত ঘুরিয়ে সে আমাকে ধরতে চেষ্টা করলো, কিন্তু হাতের ছোঁয়া লাগালেও ধরতে পারলো না। ছোট্ট শ্লথটা আমার দিকে তেড়ে এলো। লাঠিটা দিয়ে আমি সজোরে তাকে এক ঘা বসিয়ে দিলাম—পেরেক লেগে তার মুখ অনেকটা কেটে গেলো। পরক্ষণেই হেলানো চিমনির মতো সরু ফাটলটা বেয়ে আমি গিরিখাত থেকে বাইরের দিকে এগুতে লাগলাম। শুনতে পেলাম পেছনে প্রচণ্ড সোরগোল চলেছে, 'ধর, ধর! ধর ওঁকে!' ধূসর মুখের প্রকাণ্ড জীবটা এগিয়ে এসে আমার পেছনের পথটা জুড়ে দাঁড়ালো। সবাই ফের চিৎকার করে উঠলে, 'যা, এগিয়ে যা! ধর!' ততোক্ষণে আমি সঙ্কীর্ণ উৎরাইটা পেরিয়ে পশু-মানুষদের গাঁয়ের পশ্চিম দিকে সেই গন্ধকে-ঢাকা জায়গাটাতে পৌঁছে গেছি।

আমার ভাগ্য ভালো, কারণ ওই সঙ্কীর্ণ তির্যক পথ বেয়ে উঠে আসতে আমার প্রথম অনুসরণকারীটির নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছিলো। সাদা আস্তরণে ঢাকা জায়গাটা আমি এক ছুটে পেরিয়ে গেলাম। তারপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গাছপালায় ভর্তি একটা ঢালু জমি দিয়ে লম্বা লম্বা নল-খাগড়ায় ভরা একটা নিচু জমিতে গিয়ে হাজির হলাম। নল-খাগড়ার বন পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলাম একটা আগাছার জঙ্গলে। এখানে পায়ের নিচে স্যাঁতসেঁতে কালো মাটি। আমি যখন খাগড়ার বনে গিয়ে ঢুকেছি, আমার সব চাইতে কাছের অনুসরণকারীটি তখন ওই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বেয়ে বাইরে এসে পৌঁছলো। কয়েক মিনিট আমি ওই আগাছার জঙ্গল দিয়েই প্রাণপণে ছুটে চললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার পেছন আর চারদিকের বাতাস ভয়ঙ্কর সোরগোলে ভরে উঠলো।

শুনতে পেলাম ঢালু জমিটার কাছ থেকে আমার অনুসরণকারীদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। তারপর নল-খাগড়া আর ডালপালা ভাঙার আওয়াজ। ওদের মধ্যে কয়েকটা প্রাণী উত্তেজিত হয়ে ওঠা শিকারী-পশুর মতো গর্জন করছিলো। বাঁ দিক থেকে ভেসে আসছিলো স্ট্যাগ হাউণ্ডটার চিৎকার। ওই দিক থেকে আমি

মোরো এবং মণ্টগোমেরির চিৎকারও শুনতে পেলাম। চট করে আমি ডান দিকে বাঁক নিয়ে ছুটতে লাগলাম। ওই পরিস্থিতিতেও আমার মনে হলো, মণ্টগোমেরি যেন আমাকে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাতে বলছেন।

যেখানে গিয়ে হাজির হলাম, সেখানে আমার পায়ের তলায় নরম পিছল কাদা। কিন্তু আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। কোনোক্রমে হাঁটু অব্দি কাদা ঠেলে লম্বা লম্বা বেতবনের মাঝখানে একটা আঁকাবাঁকা পথে গিয়ে উঠলাম। আমার অনুসরণকারীদের সোরগোল তখন বাঁ দিকে সরে গেছে। হঠাৎ বেড়ালের মতো আকৃতি তিনটে অদ্ভুত গোলাপী রঙের জীব লাফাতে লাফাতে আমার পায়ের কাছ দিয়ে পালিয়ে গেলো। এই পথটা এঁকেবেঁকে ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠে গেছে। তারপর সাদা আস্তরণে ঢাকা ফের খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর আবার বেতবন।

পথটা আচমকা বাঁক নিয়ে একটা পাথুরে পাঁচিলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে। পাঁচিলের পাশেই একটা খাদ, কিন্তু দূর থেকে তা বোঝাই যায় না। তাই প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে আমি মাথা গুঁজে সোজা সেই খাদের মধ্যে পড়ে গেলাম। পড়লাম একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে, বাহু আর মাথার ওপরে শরীরের ভর রেখে, আর উঠলাম রক্তাক্ত মুখ নিয়ে—একটা কানও খানিকটা কেটে গেছে কাঁটার আঘাতে। আমার চোখের সামনে ছেঁড়া ছেঁড়া অজস্র কুয়াশা। সামনের সঙ্কীর্ণ নদীটা থেকে কুয়াশাগুলো উঠে এসে এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। ঝলমলে দিনের আলোয় এমনধারা কুয়াশা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তখন আর ওই নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববার অবকাশ নেই। আমি নদীর ডান ধার দিয়ে চলতে শুরু করলাম—চলতে শুরু করলাম এই আশা নিয়ে যে এভাবে আমি হয়তো সমুদ্রের কাছে গিয়ে পৌছতে পারবো এবং তাহলে আমার ডুবে মরার পথটা অন্তত খোলা থাকবে। এর বেশ খানিকটা পরেই আবিষ্কার করলাম, খাদে পড়ার সময় পেরেক তোলা লাঠিটা আমার হাত থেকে খসে পড়ে গিয়েছিলো।

একটু বাদেই গিরিখাতটা সঙ্কীর্ণ হয়ে ওঠায় আমি অসতর্কভাবে নদীতে গিয়ে নামলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে এক লাফে উঠে আসতে হলো—কারণ জলটা বেশ গরম, প্রায় ফুটন্ত। লক্ষ্য করলাম নদীর পাক-খাওয়া জলের ওপর দিয়ে গন্ধকের পাতলা প্রলেপ ভেসে চলেছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুহাপথ আর দূরের অস্পষ্ট নীল দিগন্তেও একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, সামনের সমুদ্রটা থেকে যেন অযুত সূর্য ঠিকরে উঠছে। আমি চোখের সামনে

নিজের মৃত্যু দেখতে পেলাম। কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ তখন গরম হয়ে উঠেছে, আমি তখন হাঁফাচ্ছি—উষ্ণ রক্ত নেমে আসছে আমার মুখ বেয়ে, মনের আনন্দে বয়ে চলেছে আমার শিরায় শিরায়। অনুসরণকারীদের বেশ খানিকটা পেছনে ফেলে আসতে পেরেছি বলে আমার মনে তখন খানিকটা আনন্দের ছোঁয়া। তাই ডুবে মরার কথা আমার আর মনে হলো না। যে পথ ধরে এসেছি, আমি আবার সেদিকেই ফিরে তাকালাম।

আমি কান পেতে রইলাম। কিন্তু ডাঁশ মাছি আর কাঁটার বনে উড়ে বেড়ানো কিছু ছোটো ছোটো পতঙ্গের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া বাতাসটা সম্পূর্ণ নিথর নিস্তব্ধ। তারপর দূর থেকে কুকুরের অস্পষ্ট ডাক ভেসে এলো। সেই সঙ্গে কিছু কিচিরমিচির আওয়াজ, চাবুকের স্বনন আর কিছু কণ্ঠস্বর। শব্দগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হতে হতে আবার ক্ষীণ হয়ে নদীর ওপারে একটু একটু করে মিলিয়ে গেলো। খানিকক্ষণের জন্যে ছোটাছুটির পালা এখন শেষ।

কিন্তু এতোক্ষণে বুঝলাম, পশু-মানুষদের কাছে আমি কতোটা সাহায্যের প্রত্যাশা করতে পারি।

আলোচনা

ফের মোড় ঘুরে আমি সমুদ্রের দিকে এগুতে লাগলাম। দেখলাম উষ্ণ নদীটা ক্রমশ চওড়া হয়ে আগাছা আর বালুময় একটা নিচু জায়গায় এসে পড়েছে। সেখানে অজস্র কাঁকড়া আর অসংখ্য-পা-ওলা এক ধরনের লম্বাটে প্রাণী। আমার পায়ের শব্দে তারা চমকে চমকে উঠছিলো। লোনা জলের একেবারে ধার অব্দি আমি এগিয়ে গেলাম। মনে হলো এবারে আমি নিরাপদ। কোমরে দু হাত রেখে পেছনের ঘন শ্যামল বনানীর দিকে ঘুরে তাকালাম, যেখানে ওই ধূমায়িত গিরিপথটা এসে মিশেছে। আসলে তখন আমি ভীষণ উত্তেজিত, মৃত্যুর জন্যে একেবারে মরিয়া—সত্যি কথা বলতে কি, যারা কোনোদিন কোনো বিপদের মুখোমুখি হয়নি তারা আমার এই মানসিক অবস্থাটা কিছুতেই বুঝবে না।

হঠাৎ মনে হলো এখনও আমার সামনে একটা সুযোগ রয়েছে। মোরো আর মণ্টগোমেরি এখনও তাঁদের দলবল নিয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—এই ফাঁকে আমি যদি সৈকত দিয়ে ঘুরে তাঁদের ওই ঘেরাও চত্বরটার কাছে গিয়ে হাজির

হই ? তারপর দেয়ালের গাঁথনি থেকে একটা আলগা পাথর খসিয়ে, তার আঘাতে ছোটো দরজার তালাটা ভেঙে যদি ভেতরে গিয়ে ঢুকতে পারি—যদি সেখানে ছুরি পিস্তল বা লড়াই করার মতো অন্য যে কোনো একটা অস্ত্র খুঁজে বের করতে পারি—তাহলে কেমন হয় ? তাহলে অন্তত আমার জীবনটার দাম উশুল করে নেবার মতো একটা সুযোগ আমি পাবো।

অতএব পশ্চিম দিকে ফিরে আমি জলের ধার দিয়েই এগিয়ে চললাম। অস্তগামী সূর্যের ঝলমলে আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে তুললো। পাশের সমুদ্রে তখন ছোটো ছোটো ঢেউয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় জোয়ার আসতে শুরু করেছে।

একটু পরেই সৈকতটা দক্ষিণমুখী হলো, সূর্য এলো আমার ডান দিকে। হঠাৎ দেখি, অনেকটা দূরে—সামনের ঝোপঝাড় থেকে একে একে অনেকগুলো প্রাণী বেরিয়ে আসছে···প্রথমে মোরো এবং তাঁর স্ট্যাগ হাউণ্ড, তারপর মণ্টগোমেরি এবং তারপর আরও দুজন। দৃশ্যটা দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম।

আমাকে দেখে ওঁরা হাত-পা নেড়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের এগিয়ে আসা লক্ষ্য করতে লাগলাম। আমি যাতে আগাছার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে না পারি, তাই পশু-মানুষ দুটো সেদিকে দৌড়ে গেলো। মণ্টগোমেরি সোজা ছুট লাগালেন আমার দিকে। কুকুরটাকে নিয়ে একটু ধীর গতিতে মোরোও আসতে লাগলেন তার পেছন পেছন।

অবশেষে আমি নিষ্ক্রিয়তা থেকে জেগে উঠে সোজা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রথম দিকটাতে জল খুবই কম—তিরিশ গজ যাবার আগে সমুদ্রের ঢেউ আমার কোমর অব্দি পৌঁছলো না। আবছা আবছা দেখতে পেলাম জোয়ারের সঙ্গে ভেসে আসা সামুদ্রিক প্রাণীগুলো আমার পায়ের কাছ থেকে সরে সরে যাচ্ছে।

'আরে, আপনি কি করছেন মশাই ?' মণ্টগোমেরি চিৎকার করে উঠলেন।

কোমর অব্দি জলে দাঁড়িয়ে আমি ওঁদের দিকে ঘুরে তাকালাম। মণ্টগোমেরি তখন জলের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছেন—প্রচণ্ড পরিশ্রমে ওঁর মুখখানা টকটকে লাল, মাথার লম্বা চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো, নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ায় মুখের ভেতরে অসমান দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মোরোও ইতিমধ্যে কাছে এসেছেন। তাঁর মুখটা পাণ্ডুর এবং দৃঢ়—হাতে ধরে রাখা কুকুরটা চিৎকার করে উঠলো আমার দিকে তাকিয়ে। দুজনের হাতেই ভারি চাবুক। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে এ দিকেই তাকিয়ে রয়েছে পশু-মানুষরা।

'আমি কি করছি ?' বললাম, 'আমি জলে ডুবে মরতে যাচ্ছি।'

মণ্টগোমেরি আর মোরো পরস্পরের দিকে তাকালেন। মোরো জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন ?'

'কারণ আপনার হাতে যন্ত্রণা ভোগ করার চাইতে সেটা অনেক ভালো।'

মণ্টগোমেরি বললেন, 'আমি এই কথাটাই আপনাকে বলেছিলাম !'

মোরো নিচু গলায় ওঁকে কি যেন বললেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি আপনাকে যন্ত্রণা দেবো, এ কথা ভাবলেন কেন ?'

'আমি যা দেখেছি···আর ওই যে, ওদের দেখুন !'

'চুপ করুন !' মোরো হাত তুলে বললেন।

'না, আমি চুপ করবো না ! একদিন ওরা মানুষ ছিলো—কিন্তু আজ ওরা কি হয়েছে ? আমি অন্তত ওদের মতো হবো না।'

সামনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, একটু দূরেই মলিং—মানে মণ্টগোমেরির সেই চাকরটা আর নৌকোর সেই সাদা পোশাক পরা অদ্ভুত প্রাণীগুলোর মধ্যে একটা প্রাণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও খানিকটা দূরে গাছপালার ছায়ার নিচে আমি বানর-মানুষকেও দেখতে পেলাম। তার পেছনে আরও কয়েকটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি।

'এই প্রাণীগুলো কারা ?' ওদের দিকে দেখিয়ে, ওরা যাতে আমার কথা শুনতে পায় সেজন্যে কণ্ঠস্বর ক্রমশ চড়িয়ে আমি বলতে থাকি, 'একদিন ওরা মানুষ ছিলো —আপনাদের মতোই মানুষ। কিন্তু ওদের মধ্যে খানিকটা পশুসুলভ বিকৃতি এনে আপনি ওই মানুষগুলোকে নিজের ক্রীতদাস করে তুলেছেন। কিন্তু এখনও আপনি ওদের ভয় পান। শোনো হে তোমরা—' এবারে মোরোকে দেখিয়ে আমি ওঁর পেছনদিককার পশু-মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে থাকি, 'তোমরা শোনো ! তোমরা কি বুঝতে পারো না যে এই লোক দুটো এখনও তোমাদের ভয় করে চলে ? তাহলে কেন তোমরা ওদের ভয় পাও ? তোমরা সংখ্যায় অনেক···'

'ঈশ্বরের দোহাই,' আমাকে বাধা দিয়ে মণ্টগোমেরি উঁচু গলায় বলে উঠলেন, 'আপনি চুপ করুন !'

'প্রেনডিক !' চিৎকার করে উঠলেন মোরোও।

যেন আমার কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই ওরা দুজনে একসঙ্গে এভাবে চিৎকার করে উঠলেন। ওদের পেছনে পশু-মানুষগুলোর মুখ তখন নিচের দিকে

নেমে এসেছে। ওরা ভাবছে। নিরালম্বের মতো ঝুলছে ওদের বিকৃত হাতগুলো, কাঁধগুলো উঁচু হয়ে উঠেছে কুঁজের মতো। মনে হলো ওরা আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে, মনে করার চেষ্টা করছে নিজেদের অতীত-মানব-জীবনের কিছু কিছু কথা।

আমি তখনও চিৎকার করে চলেছি। কি বলেছিলাম তা এখন আর সঠিক মনে নেই। তবে বলেছিলাম যে মোরো এবং মণ্টগোমেরিকেও খুন করা যায়, ওঁদের ভয় পাবার কিছু নেই। কিন্তু এই সমস্ত চিন্তার বোঝা, যা আমি পশু-মানুষদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলাম, তা শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষেই মারাত্মক হয়ে উঠেছিলো।

দেখলাম গাঢ় রঙের পোশাক পরা সবুজ-চোখো একটা পশু-মানুষ, এ দ্বীপে এসে পৌঁছবার দিন সন্ধ্যাবেলা আমি যাকে দেখেছিলাম, গাছপালার ভেতর থেকে সে সামনের দিকে এগিয়ে এলো। আমার কথাগুলো ভালো করে শোনার মতলবে অন্যেরাও অনুসরণ করলো তাকে।

শেষ পর্যন্ত দম ফুরিয়ে যেতে আমি চুপ করলাম।

'আপনি এক মুহূর্ত আমার কথা একটু শুনুন,' এবারে মোরো দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'তারপর আপনার যা ইচ্ছে হয় বলবেন।'

'কি ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মোরো একটু কাশলেন, কি যেন ভাবলেন, তারপর চিৎকার করে বললেন, 'আমি ল্যাটিন ভাষায় বলছি, প্রেনডিক। সহজ ল্যাটিন—স্কুলের ছেলেদের মতো! আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন।··· মানুষ থেকে পশু নয়, আমি পশুকে কেটেকুটে মানুষ তৈরি করছি। জীব-ব্যবচ্ছেদ···মানুষ তৈরি করার প্রক্রিয়া। আপনি উঠে আসুন, আমি আপনাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবো।'

'খাসা গপ্পো!' আমি হাসলাম। 'ওরা কথা বলে, বাড়ি বানায়, রান্না করে। ওরা একদিন মানুষই ছিলো। হ্যাঁ, আমি পাড়ে উঠবো বৈকি!'

'আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার ঠিক পেছনেই গভীর জল···অসংখ্য হাঙর।'

'আমার পক্ষে তা-ই ভালো। সহজে আর চট করেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।'

'এক মিনিট অপেক্ষা করুন,' মোরো পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করতেই সেটা সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠলো। জিনিসটা উনি নিজের পায়ের

কাছে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ওই রইলো আমার গুলিভরা রিভলভার। মণ্টগোমেরিও তারটা এইভাবে ফেলে দেবে। এবারে যতোক্ষণ অব্দি আপনি নিরাপদ দূরত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হচ্ছেন, ততোক্ষণ আমরা সৈকত ধরে এগিয়ে যাবো। তারপর আপনি উঠে এসে রিভলভার দুটো তুলে নেবেন।'

'আমি উঠছি না। আপনাদের সঙ্গে একজন তৃতীয় ব্যক্তি আছে।'

'আমি আপনাকে ঘটনাগুলো একটু ভেবে দেখতে বলছি, প্রেনডিক। প্রথমত, আমি কখনই আপনাকে এ দ্বীপে আসতে বলিনি। তারপর দেখুন, গতকাল রাতে আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিলো—আপনার অনিষ্ট করার ইচ্ছে থাকলে আমরা তখনই তা করতে পারতাম। এখন তো আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে, এবারে আপনি একটু ভেবে দেখতে পারবেন—আচ্ছা বলুন তো, মণ্টগোমেরিকে আপনি যে রকম চরিত্রের লোক বলে মনে করেছেন, ওকি সত্যিই তেমন? আপনার মঙ্গলের জন্যেই আমরা আপনাকে তাড়া করেছিলাম—কারণ এ দ্বীপটা…এ দ্বীপটা অনেক ক্ষতিকর জীবে বোঝাই। আপনি নিজেই তো ডুবে মরতে চাইছেন, তাহলে আমরা আর আপনাকে গুলি করতে চাইবো কেন?'

'আমি যখন কুটিরে ছিলাম তখন আপনারা কেন আপনার লোকজনকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিলেন?'

'আমরা নিশ্চিত ছিলাম আমরা আপনাকে ধরে ফেলতে পারবো, আপনাকে বিপদ থেকে বের করে আনতে পারবো। কিন্তু পরে আপনি যে দিকে গেলেন, আমরা সে দিক থেকে সরে অন্য দিকে চলে গিয়েছিলাম—তা-ও আপনার মঙ্গলের জন্যে।'

কথাটা আমি চিন্তা করে দেখলাম। ব্যাপারটা সম্ভব বলেই মনে হলো। তার পরেই ফের একটা কথা মনে হতে বললাম, 'কিন্তু চত্বরের মধ্যে আমি যে দেখলাম…'

'ওটা সেই পুমাটা।'

'দেখুন প্রেনডিক,' মণ্টগোমেরি বললেন, 'আপনি একটি নিরেট মূর্খ। এবারে জল থেকে উঠে আসুন, তারপর রিভলভার দুটো তুলে নিয়ে কথাবার্তা বলুন। আমরা এখন আপনাকে যা করতে পারি, তখন আপনার হাতে রিভলভার থাকলে তার চাইতে বেশি কিছু করতে পারবো না।'

স্বীকার করছি, তখন এবং সত্যি বলতে কি সর্বদাই, আমি মোরোকে অবিশ্বাস

করতাম—ভয় পেতাম। কিন্তু মনে হতো, মণ্টগোমেরিকে আমি বুঝতে পারি। তাই একটু চিন্তা করে বললাম, 'এগিয়ে যান।' তারপর যোগ করে দিলাম, 'মাথার ওপরে হাত তুলে যাবেন।'

'তা পারবো না।' বুঝিয়ে দেবার ভঙ্গিতে মণ্টগোমেরি পশু-মানুষগুলোর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মাথা নাড়লেন, 'ওটা অসম্মানজনক।'

'তাহলে যেভাবে খুশি যান, গাছগুলো অব্দি যাবেন।'

'যতো রাজ্যের বোকা-বোকা কাণ্ড,' মণ্টগোমেরি বললেন।

ওঁরা দুজনে মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে চললেন। ওঁদের মুখোমুখি ছ-সাতটা কিম্ভূত-কিমাকার প্রাণী। তারা সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রত্যেকেরই ত্রিমাত্রিক শরীর, তারা নড়াচড়া করছে, তাদের ছায়া পড়ছে—অথচ তারা যেন অবিশ্বাস্য রকমের অপার্থিব। মণ্টগোমেরি ওদের দিকে চাবুক হাঁকড়াতেই ওরা তাড়াহুড়ো করে গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিলো। যখন মনে হলো মণ্টগোমেরি আর মোরো যথেষ্ট দূরে চলে গেছেন, তখন আমি জল থেকে উঠে এসে রিভলভার দুটো তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। পাছে এর মধ্যে সামান্যতম চালাকি লুকিয়ে থাকে, তাই নিজেকে খুশি করার উদ্দেশ্যে আমি একটা লাভার ঢিবির দিকে একটা গুলি চালাতেই ঢিবিটা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে বালির বুকে ছিটকে পড়লো।

তবু আমি এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইলাম।

শেষ পর্যন্ত বললাম, 'ঠিক আছে, ঝুঁকিটা আমি নেবো।' তারপর দু হাতে রিভলভার দুটো নিয়ে ওঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'তবু ভালো,' মোরো নির্বিকার সুরে বললেন। 'এমনিতেই তো নিজের আজগুবি কল্পনার দৌলতে আপনি আমার দিনটার বেশির ভাগ সময়ই নষ্ট করে দিয়েছেন।'

কথার সুরে সূক্ষ্ম ঘৃণার ছোঁয়ায় আমাকে অপমানিত করে তুলে মোরো আর মণ্টগোমেরি মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দে আমার আগে আগে হাঁটতে শুরু করলেন।

পশু-মানুষের দলটা তখনও গাছপালার ভেতরে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যথাসম্ভব শান্তভাবে আমি ওদের পেরিয়ে গেলাম। একজন আমাকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু মণ্টগোমেরি চাবুকের শব্দ করতেই সে আবার পেছনে পালিয়ে গেলো। বাকি সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো—লক্ষ্য করতে লাগলো আমাদের। হয়তো একদিন ওরা পশুই ছিল। কিন্তু এর আগে আমি কোনোদিনও কোনো পশুকে চিন্তা করবার চেষ্টা করতে দেখিনি।

ডক্টর মোরোর ব্যাখ্যা

'প্রেনডিক, এবারে আমি আপনাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবো।' আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পালা মিটে যেতেই ডক্টর মোরো বললেন, 'স্বীকার করতেই হচ্ছে যে আপনার মতো কোনো একগুঁয়ে বদমেজাজী অতিথিকে আমি এর আগে কোনোদিনও আপ্যায়ন করিনি। তবে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আপনাকে বাধিত করার জন্যে এটাই আমার শেষ প্রচেষ্টা। এর পরেও যদি আপনি আবার আত্মহত্যা করার ভয় দেখান, আমি কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে যাবো না—এমন কি ব্যক্তিগতভাবে তাতে আমার কিছু অসুবিধে হলেও না।'

মোরো আমার ডেক চেয়ারটাতে বসে রয়েছেন, ওর শুভ্র কুশলী আঙুলের ফাঁকে একটা আধপোড়া চুরুট। ঝোলানো বাতিটা থেকে আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে ওঁর সাদা চুলগুলোতে। ছোট্ট জানলাটা দিয়ে উনি তাকিয়ে রয়েছেন বাইরে তারার আলোর দিকে। আমি ওঁর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে বসেছি। আমাদের মাঝখানে টেবিল—রিভলভারগুলো আমার হাতের কাছে। মণ্টগোমেরি এখানে উপস্থিত নেই। এমন একটা ছোট্ট ঘরে ওদের দুজনের সঙ্গে একত্রে থাকার কোনো ইচ্ছেও আমার ছিলো না।

'তাহলে আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন, আপনি যাকে ব্যবচ্ছিন্ন মানুষ বলে ধরে নিয়েছিলেন আসলে সেটা ওই পুমাটা—তাই তো?' মোরো জিজ্ঞেস করলেন। ব্যাপারটার অমানবিকতা সম্পর্কে আমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে উনি ইতিমধ্যেই ভেতরের ঘরের ওই বিভীষিকাটা আমাকে দেখিয়ে এনেছিলেন।

'সেই পুমাটাই বটে—এখনও জীবিত···কিন্তু কি ক্ষত-বিক্ষত আর বিকৃত! প্রার্থনা করি এমন জীবিত প্রাণী আমাকে যেন আর কোনোদিনও দেখতে না হয়। এমন নীচ জঘন্য···'

'ওসব কথা থাক,' মোরো বললেন। 'ওসব ছেলেমানুষী ভয়ের কথা আমাকে অন্তত বলবেন না। মণ্টগোমেরিও প্রথম দিকে ওসব বলতো। আপনি স্বীকার করছেন ওটা পুমা। তাহলে এবারে আমি শারীরবৃত্ত সম্পর্কে আপনাকে একটা বক্তৃতা দেবো—আপনি ততোক্ষণ চুপ করে বসে শুনুন।'

একঘেয়ে ক্লান্তিকর স্বরে বলতে শুরু করলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই মোরো

সামান্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন—নিজের কাজকর্মের কথা আমাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন উনি। ওঁর বিশ্লেষণ বেশ সহজ আর বিশ্বাসযোগ্য। মাঝেমাঝেই ওঁর কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সুর ফুটে উঠছিলো আর আমাদের পারস্পরিক অবস্থানের কথা ভেবে আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠছিলাম।

যে প্রাণীগুলোকে আমি এখানে দেখেছি, তারা মানুষ নয়—কোনোদিনও তারা মানুষ ছিলো না। ওরা সকলেই পশু—মানুষ হয়ে ওঠা পশু—ওরা জীব-ব্যবচ্ছেদের বিজয়-প্রতীক।

'জীবন্ত প্রাণীদের নিয়ে একজন সুদক্ষ জীব-ব্যবচ্ছেদী যে কতো কি করতে পারে, তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন।' মোরো বলতে লাগলেন, 'আমি যা করেছি তা আমার আগে কেউ করেনি কেন, ভেবে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। ছোটো-খাটো প্রচেষ্টা অবিশ্যি হয়েছে—যেমন অঙ্গচ্ছেদ, জিভ কেটে দেওয়া, সামান্য কাটাছেঁড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অস্ত্রোপচার করে চোখ ট্যারা করে দেওয়া যায় আবার ট্যারা চোখও সারানো যায়। ছোটোখাটো কাটাছেঁড়ার সাহায্যেও কিছু কিছু সাধারণ শারীরিক পরিবর্তন আনা যায়—যেমন ত্বকের রঙের বিকৃতি দূর করা, মানসিক আবেগের পরিমিতি আনা, চর্বি সৃষ্টিকারী গ্রন্থির ক্ষরণে পরিবর্তন আনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সমস্ত কথা আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে শুনে থাকবেন।'

'অবশ্যই,' বললাম, 'কিন্তু আপনার ওই কুৎসিত প্রাণীগুলো...'

'সবই সময়মতো বলবো,' মোরো আমার দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'সবে তো বলতে শুরু করেছি। ওগুলো নেহাতই তুচ্ছ, মামুলি অদলবদলের ব্যাপার। অস্ত্রোপচারে এর চাইতেও ভালো কাজ করা যায়। অস্ত্রোপচার ভাঙে, গড়ে, পরিবর্তন আনে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, নাক জখম হলে এক ধরনের অতি সাধারণ অস্ত্রোপচারের সাহায্যে তাকে আবার সুন্দর করে গড়ে তোলা হয়। কপাল থেকে একফালি চামড়া কেটে নিয়ে নাকের জখমি জায়গায় বসিয়ে দিলে, সেটা নতুন জায়গায় চমৎকার ভাবে জুড়ে যায়। এ তো গেলো একই প্রাণীর শরীরের একটা অংশ অন্য অংশে বসিয়ে জোড়াতালি লাগাবার প্রক্রিয়া। তেমনি একটা প্রাণীর দেহ থেকে সদ্য সংগ্রহ করা অংশ অন্য প্রাণীর দেহেও জোড়া লাগানো সম্ভব—যেমন ধরুন দাঁত। ক্ষত সারাবার জন্যে নতুন করে চামড়া এবং হাড় বসিয়ে জোড়া লাগানো হয়। অন্য কোনো প্রাণীর দেহ থেকে চামড়া বা কোনো সদ্য নিহতের দেহ থেকে সংগ্রহ করা হাড়ের টুকরো নিয়ে শল্য চিকিৎসক সেটা ক্ষত-

স্থানের মাঝখানে বসিয়ে দেন। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, হাণ্টার সাহেব মোরগের নখর ষাঁড়ের কাঁধে জুড়ে দিয়েছিলেন। আলজেরিয়ার জুয়াভদের গণ্ডার-ইঁদুরগুলোর কথাও ভেবে দেখুন—সাধারণ ইঁদুরের লেজ থেকে খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে তা গণ্ডারের নাকে জুড়ে দিয়ে ওই দানবগুলোকে তৈরি করা হয়।'

'দানব তৈরি করা হয়! তার মানে আপনি আমাকে বলতে চাইছেন…'

'হ্যাঁ। এখানে যে প্রাণীগুলোকে আপনি দেখছেন, তারা সবাই পশু—কেটে জুড়ে তাদের নতুন আকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে—জীবিত প্রাণীর আকৃতি পরিবর্তনের সাধনায়—আমার সমস্ত জীবন নিবেদিত। বছরের পর বছর আমি এই নিয়ে পড়াশুনো করেছি, যতোই দিন কেটেছে ততোই জ্ঞান অর্জন করেছি। দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি শুনুন, এটা নতুন কিছু নয়। এটা ব্যবহারিক অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার একেবারে গোড়ার কথা—কিন্তু কারুরই এ ব্যাপারে হাত লাগাবার মতো দুঃসাহস হয়নি। আমি যে কোনো প্রাণীর শুধুমাত্র বাইরের চেহারারই পরিবর্তন ঘটাতে পারি, তা নয়। তার শারীরবৃত্ত এবং রাসায়নিক ছন্দের মধ্যেও স্থায়ী পরিবর্তন আনা সম্ভব—টিকা এবং জীবিত বা মৃত পদার্থের সঙ্গে বীজ নিবেষণের অন্যান্য প্রক্রিয়া এরই উদাহরণ, যেগুলো নিঃসন্দেহে আপনার পরিচিত।

'রক্ত দেহান্তকরণের ব্যাপারটাও ঠিক এই একই রকম এবং এটা নিয়েই আমি প্রথমে বিষয়টার ওপরে কাজ করতে শুরু করি। এ সমস্ত ব্যাপারগুলো এখন অনেকেরই জানা। কিন্তু অনেকের কাছে কম জানা হলেও এ ব্যাপারে সম্ভবত অনেক ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন মধ্যযুগের শল্যবিদরা, যারা দানব-প্রদর্শনীর জন্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বামন বা বিকলাঙ্গ ভিখারীর সৃষ্টি করতেন। দু-চারজন হাতুড়ে ডাক্তারের হাতের কাজে আজও এই শিল্পকলার খানিকটা সাক্ষ্য রয়ে গেছে। ভিক্তর ইউগো তাঁর একখানা বইতে এদের কথা লিখে গেছেন।

'এবারে হয়তো আমার কথাগুলোর অর্থ আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন, যে কোনো জীবদেহের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা ক্রমোবৃদ্ধির পদ্ধতির পরিবর্তন আনার জন্যে কিংবা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জটিলতা সুষম করার জন্যে তার দেহের এক অংশের কোষকলা অন্য অংশে, এমন কি তা এক দেহ থেকে অন্য দেহেও স্থাপন করা সম্ভব এবং এর ফলে তার দেহের আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে সত্যিই এক আমূল পরিবর্তন আনা যায়—তাই নয় কি?

'অথচ আমার আগে কোনো আধুনিক গবেষকই বিজ্ঞানের এই অসাধারণ

শাখাকে নিজের গবেষণার চরম বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে সুশৃঙ্খলভাবে এগোন-নি! শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে শেষ অবলম্বন হিসেবে কিছু কিছু কাজ অবিশ্যি হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে যে কটা উদাহরণের কথা আপনার মনে পড়বে তার অধিকাংশই হয়ে গেছে আকস্মিকভাবে এবং সেগুলো করেছে কোনো অত্যাচারী, অপরাধী কিংবা ঘোড়া আর কুকুরের পালক—তার মানে নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে অশিক্ষিত মানুষেরাই এ সমস্ত ব্যাপার হঠাৎ করে ফেলেছে। কিন্তু বীজবারক শল্যবিদ্যা এবং জীবকোষের বৃদ্ধি সম্পর্কে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়ে আমিই প্রথম এই বিষয়টাকে নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করি।

'অবিশ্যি কেউ কেউ মনে করেন, আগেও লুকিয়ে-চুরিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু কিছু কাজ হয়েছে। যেমন ধরুন শ্যামদেশীয় যমজ···তা ছাড়া কিছু কিছু তদন্তের ক্ষেত্রেও। নিঃসন্দেহে শিল্পসম্মত অত্যাচারই ছিলো এদের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু তদন্তকারীদের মধ্যে অন্তত কয়েকজনের নিশ্চয়ই খানিকটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিলো।···'

'কিন্তু এরা,' আমি বললাম, 'এই প্রাণীগুলো যে কথা বলে!'

মোরো কথাটা স্বীকার করে নিয়ে আমাকে বোঝাতে শুরু করলেন যে, জীব-ব্যবচ্ছেদের অসীম সম্ভাবনা শুধুমাত্র চেহারার রূপান্তরেই শেষ নাও হতে পারে। একটা শুয়োরকেও শিক্ষা দেওয়া যায়। দেহের চাইতে মনের কাঠামো অনেক বেশি শিথিল। ক্রমশ গড়ে ওঠা সম্মোহন-বিজ্ঞানে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বংশগত প্রবৃত্তি, অভ্যেস বা বদ্ধমূল ধারণাকেও বদলে দেবার সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত দেখতে পাই। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যাকে নৈতিক শিক্ষা বলি তা আসলে স্বাভাবিক প্রকৃতির কৃত্রিম পরিবর্তন বা বিকৃতি। শিক্ষার মাধ্যমে কলহপ্রিয়তাকে শৌর্যময় আত্মত্যাগ এবং অবদমিত কামনাকেও ধর্মীয় আবেগে রূপান্তরিত করা যায়। উনি আরও বললেন, মানুষ এবং বানরের মধ্যে সবচাইতে বড়ো প্রভেদ উভয়ের স্বরযন্ত্রে। যে সমস্ত শব্দ-প্রতীকের সাহায্যে মনের চিন্তাকে প্রকাশ করা যায়, তাদের মধ্যে প্রভেদ এতো সূক্ষ্ম যে বানরের স্বরযন্ত্র তা উচ্চারণে অক্ষম। এ বিষয়ে আমি মোরোর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, কিন্তু খানিকটা অভদ্রভাবেই উনি আমার আপত্তি কানে না তুলে নিজের গবেষণার কথা বলে যেতে লাগলেন।

আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের আকৃতিকেই উনি আদর্শ হিসেবে বেছে নিলেন কেন। তখন আমার মনে হয়েছিলো, এখনও মনে হয়, এই বেছে নেবার পেছনে ওঁর নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব ছিলো। কিন্তু উনি স্বীকার করে নিলেন,

নেহাৎ দৈবক্রমেই এটা হয়ে গেছে। বললেন, 'আমি ভেড়া থেকে লামা বা লামা থেকে ভেড়া তৈরি করার প্রচেষ্টা নিয়েও কাজে লাগতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অন্য কোনো প্রাণীর চেহারার চাইতে আমাদের মনের সৌন্দর্যবোধের কাছে অনেক বেশি আবেদন রাখে। তবে কিনা শুধুমাত্র মানুষ-তৈরির কাজেই আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখিনি। দু-একবার...' মিনিট খানেক নিশ্চুপ হয়ে থাকার পর উনি ফের বলতে শুরু করলেন, 'এতোগুলো বছর! কিভাবে যে দিনগুলো কেটে গেলো! অথচ আপনার প্রাণটা বাঁচাতে গিয়ে আমি পুরো একটা দিন নষ্ট করলাম, এখন আবার বোঝাতে গিয়ে একটি ঘণ্টা নষ্ট করছি।'

'কিন্তু পশুদের এতো যন্ত্রণা দেবার পেছনে আপনার কি এমন যুক্তি থাকতে পারে, তা আমি এখনও বুঝতে পারছি না। যদি কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগানো যায়, একমাত্র তবেই আমি জীব-ব্যবচ্ছেদকে মেনে নিতে পারি।'

'ঠিক কথা। কিন্তু আমি অন্য ধাতের মানুষ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। আপনি একজন জড়বাদী।'

'আমি মোটেই জড়বাদী নই,' আমি রেগে উঠলাম।

'আমার চোখে—আমার দৃষ্টিতে আপনি তাই। কারণ একমাত্র এই যন্ত্রণার প্রশ্নেই আমাদের মতভেদ হচ্ছে। যন্ত্রণা দেখে বা শুনে আপনি যদি বিচলিত হন, যন্ত্রণায় আপনি যদি উতলা হয়ে ওঠেন, যন্ত্রণার নিরিখেই আপনি যদি পাপ-পুণ্যের বিচার করেন তাহলে আমি বলবো আপনিও পশু—তবে পশুর অনুভূতি-শক্তির তুলনায় আপনার চিন্তাশক্তি একটু কম অস্পষ্ট। এই যন্ত্রণা...'

এ ধরনের বাজে তর্কে বিরক্ত হয়ে আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

'আরে, এটা তো একটা সামান্য জিনিস! বিজ্ঞানের শিক্ষণীয় দিকে সত্যিকারের খোলা মন নিয়ে তাকালেই বোঝা যায়, যন্ত্রণার ব্যাপারটা কতো তুচ্ছ। হয়তো আমাদের এই ছোট্ট গ্রহটা ছাড়া অনন্ত চরাচরের কোথাও যন্ত্রণা বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্বই নেই। এমন কি এই পৃথিবীতে, জীবিত প্রাণীর মধ্যেই বা কতোটুকু যন্ত্রণাবোধ আছে, বলুন তো?'

কথা বলতে বলতেই পকেট থেকে ছোট্ট একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি বের করে ডক্টর মোরো কুর্সিতে এমনভাবে বসলেন যাতে আমি ওঁর উরুটা দেখতে পাই। তারপর ইচ্ছেমতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে ছুরির ফলাটা পায়ে বসিয়েই আবার তুলে নিলেন।

'এ ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে আপনি আগেও দেখেছেন। কিন্তু এতে কি বোঝা গেলো? পেশীতে যন্ত্রণাবোধ নেই, কারণ সেখানে তা থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ত্বকেও তার প্রয়োজন অতি সামান্য। উরুর এখানে-সেখানে মাত্র গুটি-কয়েক জায়গা যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারে। যন্ত্রণাবোধ আসলে স্রেফ আমাদের সহজাত চিকিৎসক-উপদেষ্টা—যা আমাদের সাবধান করে দেয়, উদ্দীপনা যোগায়। সমস্ত প্রাণময় পেশী বা স্নায়ুতে, এমন কি সবকটা সংজ্ঞাবহ স্নায়ুতেও যন্ত্রণার অনুভূতি নেই। চোখের স্নায়ুতে বেদনাবোধের লেশমাত্রও অস্তিত্ব নেই। চোখের স্নায়ুতে আঘাত লাগলে শুধু আলোর ঝলসানি দেখা যায়, যেমন শ্রবণযন্ত্রের স্নায়ু অসুস্থ হলে আমরা কানের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনতে পাই। গাছপালার মধ্যেও ব্যথা বেদনার কোনো অনুভূতি নেই। ইতর জাতের প্রাণী—যেমন ধরুন তারা মাছ বা বাগদা-চিংড়ি—এরা কোনো ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না। তারপর ধরুন মানুষের কথা। মানুষের বুদ্ধিমত্তা যতোই বাড়বে, ততোই সে আরও বুদ্ধিমানের মতো নিজের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখবে…নিজেকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্যে তখন সে আর যন্ত্রণার অঙ্কুশের ততোটা প্রয়োজন অনুভব করবে না। আগে হোক বা পরে হোক, ক্রমবিকাশের পর্যায়ে অস্তিত্ব থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি এমন কোনো অপ্রয়োজনীয় বস্তুর কথা আমি আজ অব্দি শুনিনি।

'প্রেনডিক, প্রতিটি সুস্থমস্তিষ্ক মানুষের মতো আমিও ধর্মপ্রাণ। বিশ্বস্রষ্টার লীলা আপনার চাইতে আমি হয়তো বেশি করেই লক্ষ্য করেছি—কারণ সারাটা জীবন তাঁর বিধানকে আমি নিজের পছন্দমতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছি, আর আপনি তো শুনেছি প্রজাপতি সংগ্রহ করতেন। একটা কথা বলি শুনুন, আনন্দ আর বেদনার সঙ্গে স্বর্গ বা নরকের কোনো সম্পর্ক নেই। আনন্দ আর বেদনা! ধ্যুস!…মানুষ আনন্দ আর বেদনার মধ্যে এই যে প্রভেদ সৃষ্টি করেছে, এটাই তাদের মধ্যে পশুত্বের লক্ষণ—এতেই প্রমাণ হয়, পশু থেকে মানুষের উদ্ভব। বেদনা! বেদনা আর আনন্দ—যতোদিন আমরা ধুলোয় লুটোপুটি খাবো ততোদিনই এরা আমাদের।…

'দেখুন, আমার এ গবেষণা আমাকে যেদিকে নিয়ে গেছে আমি সেদিকেই গেছি। আমার মনে এক-একটা প্রশ্ন জেগেছে, আমি তার জবাব পাবার এক-একটা পথ খুঁজে বের করেছি। তারপর ফের একটা নতুন প্রশ্ন এসে হাজির হয়েছে। মনে হয়েছে, এটা কি সম্ভব? কিংবা এটা? একজন গবেষকের কাছে এর মূল্য যে কতোটা, জ্ঞান অর্জনের কি যে আবেগ তাকে পেয়ে বসে—তা আপনি

কল্পনাও করতে পারবেন না। গবেষণার প্রাণীটা তখন আর প্রাণী থাকে না, হয়ে ওঠে বিষয়বস্তু। মনে পড়ে, সহানুভূতির বেদনা নামে বস্তুটা আমি অনুভব করতাম আজ থেকে বহু বছর আগে। আমার কামনা—আমার একমাত্র কামনা ছিলো, জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে নমনীয়তার চরম সীমা খুঁজে বের করা।'

'কিন্তু জিনিসটা এতো ঘৃণ্য…'

'আজ অব্দি এ বিষয়টার নৈতিক দিক নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। প্রকৃতির পাঠ নিতে গেলে মানুষ শেষ অব্দি প্রকৃতির মতোই নির্মম হয়ে ওঠে। অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে শুধু নিজের প্রশ্নের জবাব পেতে আমি ক্রমাগত এগিয়ে গেছি—আর তার ফসল—ওই দেখুন, ওই কুটিরগুলোতে গিয়ে রয়েছে।…আজ প্রায় এগারো বছর হয়ে গেলো আমরা এখানে এসেছি—আমি, মন্টগোমেরির আর ছজন ক্যানাকা। দ্বীপটার সেই শান্ত সবুজ সৌন্দর্য আর চারদিকে নির্জন মহাসমুদ্র—মনে হয় যেন গতকালের কথা। মনে হয়েছিলো, জায়গাটা যেন আমাদের জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলো এতোদিন।

'মালপত্র নামানো হলো, বাসস্থানটাও তৈরি করা হলো। ক্যানাকারা গিরিখাদটার কাছে নিজেদের মতো করে কয়েকটা কুটির বানালো। সঙ্গে যা নিয়ে এসেছিলাম, তাদের নিয়েই আমি এখানে এসে কাজে লেগে গেলাম। প্রথম দিকে কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিলো। একটা ভেড়া নিয়ে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু দেড় দিন কাজ করার পর, হাতের ছুরি ফসকে যাওয়ায় সেটা মারা পড়লো। ফের একটা ভেড়া নিয়ে কাজ শুরু করলাম। কিন্তু সেটা যন্ত্রণা আর আতঙ্কের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠলো। ক্ষত শুকোবার জন্যে সেটাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রেখেছিলাম। কাজ শেষ হতে সেটাকে দেখতে-শুনতে মানুষের মতোই মনে হলো, কিন্তু তার কাছে গিয়ে আমি খুশি হতে পারলাম না। জন্তুটা আমাকে মনে রেখেছিলো—আমাকে দেখেই সে এতো আতঙ্কিত হয়ে উঠতো যে তা কল্পনাও করা যায় না। তা ছাড়া ভেড়ার চাইতে বেশি বুদ্ধিসুদ্ধিও তার হলো না। ওকে যতোই দেখতাম ততোই বেশি কুৎসিত বলে মনে হতো। তাই শেষ অব্দি ওই দানবটাকে আমি সমস্ত দুর্দশা থেকে মুক্তি দিলাম। এই সমস্ত ভীতু, শঙ্কিত, যন্ত্রণা-কাতর প্রাণী—যাদের মধ্যে যন্ত্রণা সহ্য করার মতো সাহসের স্ফুলিঙ্গ নেই—তারা মানুষ হবার উপযুক্ত নয়।

'তারপর একটা গরিলাকে নিয়ে কাজে লাগলাম। এবং অসীম সতর্কতায় কাজ করে একটার পর একটা বাধা পেরিয়ে আমি আমার প্রথম মানুষটিকে

তৈরি করলাম। পুরো সপ্তাহটা দিন-রাত খেটে আমি ওকে গড়ে তুলেছিলাম। ওর মস্তিষ্কটা সঠিকভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিলো সব চাইতে বেশি—অনেক কিছু জুড়তে হয়েছে, অনেক কিছু বদলাতে হয়েছে। কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ও যখন সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে, তখন ওকে দেখে নিগ্রো জাতীয় মানুষের একটা চমৎকার উদাহরণ বলেই মনে হলো। ওর জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার পর নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখি, মণ্টগোমেরির অবস্থা অনেকটাই আপনার মতো। জীবটার 'মানুষ' হয়ে ওঠার সময়কার কিছু কান্না সে শুনতে পেয়েছিলো—যে ধরনের কান্না আপনাকেও বিচলিত করে তুলেছিলো। আসলে প্রথমটাতে মণ্টগোমেরিকেও আমি বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলিনি।

'ক্যানাকারাও ব্যাপারটার খানিকটা বুঝতে পেরে গিয়েছিলো। আমাকে দেখলেই ওরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠতো। মণ্টগোমেরিকে কোনো রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের দলে পেলাম, কিন্তু আমাদের দুজনের পক্ষেও ক্যানাকাদের আটকানো শক্ত কাজ হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত ওরা চলেই গেলো, অতএব আমরাও ইয়টটাকে হারালাম।

'গরিলাটাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার কাজে আমি অনেকগুলো দিন ব্যয় করেছি—মোট তিন-চার মাস ওকে আমি কাছে রেখেছিলাম। ওকে আমি ইংরেজী ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞানটা দিয়েছিলাম, গুণতে শিখিয়েছিলাম। এমন কি বর্ণমালা পড়তেও শিখিয়েছিলাম। কিন্তু ও বড্ড ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো, যদিও নির্বোধদের মধ্যে ওর চাইতে ধীরজ মানুষও আমি দেখেছি। মানসিক দিক থেকেও ও একেবারে নতুন করে জীবন শুরু করেছিলো, অতীত জীবনের কোনো স্মৃতিই ওর মনে অবশিষ্ট ছিলো না। ক্ষতস্থানগুলো শুকিয়ে যাবার পরে ওর মধ্যে কিছুটা জ্বালা-যন্ত্রণা আর খানিকটা আড়ষ্টতা ছাড়া অন্য কোনো অসুবিধে রইলো না। তখন ও একটু একটু কথাবার্তাও বলতে পারে। তাই আমি ওকে নিয়ে গিয়ে ক্যানাকাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।

'যে কোনো কারণেই হোক ক্যানাকারা প্রথম দিকে ওকে ভীষণ ভয় পেতো—এতে আমি খানিকটা অপমানিত বোধ করেছিলাম, কারণ ও ছিলো আমার গর্বের জিনিস। কিন্তু ওর হাবভাব এতো নিরীহ আর গোবেচারা ধরনের ছিলো যে কিছুদিন পরে তারাই ওকে মেনে নিলো আর ওর শিক্ষার ভারও নিজেদের হাতে তুলে নিলো। এবারে কিন্তু ও খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে

লাগলো—ভীষণ অনুকরণ করতে পারতো ও, আর পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েও নিতে পারতো। নিজের জন্যে ও এমন একটা কুটির গড়ে নিলো যেটা আমার কাছে ক্যানাকাদের ঝুপড়িগুলোর চাইতেও সুন্দর বলে মনে হয়েছিলো। ওদের মধ্যে একজন ছিলো খানিকটা মিশনারিদের মতো—সে-ই ওকে পড়তে শেখালো কিংবা বলা যায় বর্ণগুলোকে চিনতে শেখালো। নৈতিকতা সম্পর্কে খানিকটা প্রাথমিক জ্ঞানও সে ওকে দিয়েছিলো। কিন্তু আমার মনে হতে লাগলো জন্তুটার অভ্যেসগুলো ঠিক আশানুরূপ নয়।

'কয়েকটা দিন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ভাবছিলাম, পুরো ঘটনাটা লিখে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিই—সেখানকার শারীরতত্ত্ববিদরা জেগে উঠুক। কিন্তু একদিন দেখি, প্রাণীটা একটা গাছে উবু হয়ে বসে কিচিরমিচির করে দুজন ক্যানাকাকে যেন কি বলছে—তারা ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছিলো। আমি ওকে কষে ধমক লাগালাম, ওর মধ্যে লজ্জার অনুভূতি জাগিয়ে তুললাম, ওকে বললাম যে মানুষ কখনও এমন করে না। তারপর ফিরে এসে ঠিক করলাম, আরও উন্নত শ্রেণীর প্রাণী সৃষ্টি করে তবেই আমি আমার কাজের কথা ইংলণ্ডে জানাবো। এখন আমার কাজ ক্রমশই ভালো হচ্ছে। কিন্তু কেন জানি না, কিছুদিন কাটার পর প্রাণীগুলো আবার তাদের পুরনো পর্যায়ে ফিরে যাচ্ছে…দিনের পর দিন একটু একটু করে তাদের মধ্যে আবার পশুত্ব জেগে উঠছে। তবে আমি আরও উন্নত মানুষ সৃষ্টি করতে চাই, আমার এ ত্রুটিকে আমি জয় করবোই। এই পুমাটা …

'কিন্তু এই হচ্ছে আমার কাহিনী। ক্যানাকা ছেলেগুলো সবাই এখন মৃত। একজন লঞ্চ থেকে জলে পড়ে মারা যায়। একজন মারা যায় গোড়ালির ক্ষতে—ক্ষতটাকে সে যে করেই হোক কোনো লতাপাতার রস লাগিয়ে বিষাক্ত করে ফেলেছিলো। তিনজন ইয়তটাতে চেপে পালিয়ে যায়—আমার মনে হয় এবং আমি আশা করি, তারা ডুবেই মারা গেছে। অন্যজন…অন্যজন খুন হয়। তবে তার অভাব আমি পুষিয়ে নিয়েছি। প্রথমটাতে মণ্টগোমেরিও আপনার মতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, তারপর …'

'অন্য ক্যানাকাটার কি হয়েছিলো?' আমি তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'কি করে সে খুন হলো?'

'আসলে বেশ কয়েকটা মানুষ তৈরি করার পর আমি একটা জীব সৃষ্টি করেছিলাম…' ডক্টর মোরো ইতস্তত করতে লাগলেন।

'তারপর?'

'সে খুন হয়ে যায়।'

'বুঝলাম না। আপনি কি বলতে চাইছেন যে…'

'হ্যাঁ, সেই জীবটাই ক্যানাকাটাকে খুন করেছিলো। তাকে মেরে ফেলার আগে অব্দি সে যাকে পেয়েছে তাকেই মেরেছে। কাজ শেষ করার আগেই সেটা দৈবক্রমে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যায়—তার তখনও ছাড়া পাবার কথা নয়। স্রেফ পরীক্ষামূলকভাবেই তাকে তৈরি করা হচ্ছিলো। ছাড়া পাবার সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলতে কিছু ছিলো না, মুখটা যন্ত্রণায় বীভৎস, সরীসৃপের মতো মাটিতে শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে এগুতো, এদিকে দেহে প্রচণ্ড শক্তি। বেশ কয়েকটা দিন সে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ছিলো, তখন যাকে পেয়েছে তারই অনিষ্ট করেছে। তারপর আমাদের তাড়া খেয়ে সে দ্বীপের উত্তর দিকে পালিয়ে যায়। আমরা তখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে জাল গুটিয়ে আনতে থাকি। ক্যানাকাটার হাতে একটা রাইফেল ছিলো—তার দেহটা যখন আবিষ্কার করা হয় তখন দেখা গেলো রাইফেলের নলটা দুমড়ে গেছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে সেটাকে প্রায় ফুটো করে ফেলা হয়েছে।… শেষ অব্দি মণ্টগোমেরি গুলি করে জীবটাকে মেরে ফেলে।… সেই থেকে সামান্য কয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া আমি মানুষের আদলেই জীব গড়ে তুলছি।'

মোরো চুপ করলেন। আমিও চুপচাপ বসে ওঁর মুখটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

'ইংলণ্ডে থাকাকালীন নটা বছরকে ধরলে সব মিলিয়ে মোট বিশ বছর হলো আমি এই গবেষণার কাজ করে চলেছি। কিন্তু আজও প্রতিটা ক্ষেত্রেই এমন কিছু থেকে যাচ্ছে যা আমার পরাজয়, আমার অসন্তুষ্টির কারণ। কখনও কখনও কাজের ক্ষেত্রে আমি নিজের ক্ষমতার সীমাকে অতিক্রম করে যাই, কখনও আবার সেখানে গিয়ে পৌঁছতেও পারি না—কিন্তু কোনো সময়েই আমার স্বপ্নের সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ মনো-মতো করে গড়ে তুলতে পারি না। এখন আমি প্রায় অনায়াসেই মানুষের রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারি, শুধু একটু মুশকিল হয় হাত আর থাবা নিয়ে। কিন্তু আমার সবচাইতে বড়ো সমস্যা ওদের মস্তিষ্ক—অতি সাবধানে সেখানে সংযোজন বা পরিবর্তনের কাজ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ওদের বুদ্ধিবৃত্তি ভীষণ কম। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, ঠিক কোন্ জায়গাটা ওদের আবেগের আশ্রয়স্থল —তাই সেখানে আমি হাত ছোঁয়াতে পারি না। আমি আজও জানি না কোথায় লুকিয়ে থাকে ওদের সেই সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি, বাসনা বা লিপ্সা, যা মনুষ্যত্বের পক্ষে ক্ষতিকর…বুঝি না কোথায় সেই আশ্চর্য গুপ্ত আধার যা আচমকা ফেটে গিয়ে জীবের সমস্ত অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দেয় ক্রোধ, ঘৃণা আর আতঙ্কের জোয়ারে।

'খেয়াল করে দেখার পর আমার এই প্রাণীগুলোকে আপনার অদ্ভুত আর অপার্থিব বলে মনে হয়েছে। অথচ ওদের তৈরি করার পরেই আমার কিন্তু মনে হয়েছে, ওদের দেখতে নিঃসন্দেহে মানুষের মতো। পরে লক্ষ্য করতে করতে আমার ধারণাটা ফিকে হয়ে গেছে। আমি দেখেছি, একটা একটা করে ওদের মধ্যে পশুত্বের লক্ষণগুলো ফুটে উঠছে।...কিন্তু এ ত্রুটিকে আমি জয় করবোই। যতোবার আমি একটা জীবন্ত প্রাণীকে যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধে তুলি ততোবারই আমি বলি, এবারে আমি জন্তুটার ভেতরকার সমস্ত পশুত্বকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে ফেলবো—এবারে আমি একটা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নতুন প্রাণীর সৃষ্টি করবো। হয়তো আরও দশটা বছর সময় লাগবে। কিন্তু শত হলেও, দশটা বছর আর কতোটুকু সময়? মানুষের সৃষ্টি হতে তো কতো লক্ষ বছর সময় লেগেছে!'

মোরোর মুখে চিন্তার ছায়া ঘনালো, 'আমি দ্রুত নিখুঁত হবার পথে এগিয়ে চলেছি। আমার এই পুমাটা...'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর উনি ফের বললেন, 'কিন্তু ওরা আবার পশু হয়ে যায়! আমার কাছ থেকে চলে যাবার পরেই ওদের ভেতরকার পশুটা আবার একটু একটু করে গুঁড়ি মেরে ফিরে আসতে শুরু করে...'

'তখন আপনি ওদের ওই গুহাগুলোতে নিয়ে যান?'

'ওরা চলে যায়। যখনই ওদের মধ্যে পশুত্বের উপস্থিতি বুঝতে পারি, আমি ওদের দূর করে তাড়িয়ে দিই। আমাকে আর এই বাড়িটাকে ওরা ভীষণ ভয় পায়। ওই কুটিরগুলোতে মনুষ্যত্বের কিছু হাস্যকর অনুকরণ রয়ে গেছে। মণ্টগোমেরি সব জানে, সে ওদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। সে ওদের মধ্যে দু-একজনকে শিক্ষা দিয়ে আমাদের কাজেও লাগিয়ে দিয়েছে। বললে মণ্টগোমেরি লজ্জা পায়—কিন্তু আমার বিশ্বাস ওদের মধ্যে কয়েকটা পশুকে সে খানিকটা পছন্দও করে। কিন্তু সেটা তার ব্যাপার, আমার নয়। ওরা আমাকে শুধু বিফলতার অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। ওদের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমার ধারণা, ওরা এখনও সেই মিশনারী ক্যানাকাটার নির্দেশিত পথেই জীবন কাটায়। ওদের মধ্যে 'আইন' বলে একটা বস্তু আছে। 'তাঁর' উদ্দেশ্যে ওরা প্রার্থনা-গান গায়। ওরা নিজেরাই নিজেদের বাসস্থান তৈরি করে, ফলমূল সংগ্রহ করে, এমন কি বিয়েও করে। কিন্তু এসবের ভেতর দিয়েও আমি ওদের আত্মাটাকে দেখতে পাই—সেখানে পশুর আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। ওদের মধ্যে উন্নতি করারও একটা প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু তা যেন আমাকে বিদ্রূপ করে।

…তবে ওই পুমাটার ওপরে আমার খানিকটা ভরসা আছে…ওর মাথা আর মস্তিষ্ক নিয়ে আমি কঠিন পরিশ্রম করেছি।…

'তাহলে এখন আপনার কি মনে হচ্ছে, বলুন—' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মোরো উঠে দাঁড়ালেন। 'এখনও কি আমার সম্পর্কে আপনার ভয় আছে ?'

আমি ওঁর দিকে তাকালাম। কিন্তু ওঁর ফ্যাকাশে মুখ, শুভ্র চুল আর শান্ত চোখ দুটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। প্রশান্ত মুখে প্রায় সৌন্দর্যের ছোঁয়া-লাগা নিবিড় গাম্ভীর্য আর বলিষ্ঠ আঙ্গিক গড়ন না থাকলে ওঁকে আর পাঁচটা সুখী বৃদ্ধের সমগোত্রীয় বলে চালিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু তারপরেই আমি শিউরে উঠলাম। ওঁর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হিসেবে রিভলভার দুটো তুলে দিলাম ওঁর হাত দুটিতে।

'ও দুটো আপনার কাছেই রেখে দিন,' মোরো হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি দুটো ঘটনাবহুল দিন কাটালেন। আমি বলি কি, আপনি খানিকটা ঘুমিয়ে নিন। এখন তো সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেলো। আচ্ছা, শুভরাত্রি—'

মুহূর্তকাল কি যেন চিন্তা করে, উনি ভেতরের দরজাটা দিয়ে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাইরের দরজায় চাবি লাগিয়ে ফের বসে পড়লাম। বেশ খানিকক্ষন বসে রইলাম একটা জড় স্তূপের মতো। শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে এতো ক্লান্ত যে মোরো আমাকে যেখানে এনে ছেড়ে দিয়েছেন তারপরে আর কিছু চিন্তা করার মতো ক্ষমতাটুকুও আমার নেই। অন্ধকার জানলাটা যেন একটা চোখের মতো তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। অবশেষে সচেষ্ট প্রয়াসে বাতিটা নিভিয়ে আমি দড়ির দোলনাটাতে উঠে শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমিয়েও পড়লাম খুব শীগগিরি।

পশুমানুষদের কথা

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই মোরোর কথাগুলো মনে পড়ে গেলো। দোলনা থেকে নেমে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখে আশ্বস্ত হলাম, দরজাটা তখনও চাবি বন্ধই আছে। এবারে জানলার গরাদগুলো টেনেটুনে দেখলাম, সেগুলোও শক্ত

করেই কাঠামোর সঙ্গে আটকানো। মানুষের মতো দেখতে ওই প্রাণীগুলো যে আসলে দানব, মানুষের স্রেফ ব্যর্থ অনুকরণ—তা ভাবতেই আমার মনটা এক অস্পষ্ট আতঙ্কে ভরে উঠেছিলো, যা কোনো সুনির্দিষ্ট ভয়ের চাইতেও মারাত্মক। একটু পরেই দরজায় ঠকঠক আওয়াজ আর সেই সঙ্গে মলিঙের জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। একটা রিভলভার পকেটস্থ করে (তাতে হাত রেখে) আমি দরজাটা খুলে দিলাম।

'সুপ্রভাত স্যার,' যথারীতি ফলমূলের প্রাতরাশসহ খানিকটা অখাদ্য করে রাঁধা খরগোশের মাংস নিয়ে মলিং ঘরে এসে ঢুকলো। তার পেছনে মণ্টগোমেরি। আমার হাতের অবস্থান লক্ষ্য করে উনি মুচকি হাসলেন।

ক্ষতস্থান শুকোবার জন্যে সেদিন পুমাটার বিশ্রাম। কিন্তু অদ্ভুত নির্জনতা প্রিয় স্বভাবের জন্যে মোরো সেদিনও আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশে যোগ দিলেন না। পশু-মানুষদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাবার উদ্দেশ্যে আমি মণ্টগোমেরির সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করলাম। বিশেষ করে এই অমানুষিক দানবগুলো কেন মোরো, মণ্টগোমেরি বা একে অন্যকে আক্রমণ করে না তা জানার জন্যে আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম।

মণ্টগোমেরি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, মোরো এবং তাঁর অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার কারণ হচ্ছে, এই দানবগুলোর সীমায়িত মানসিক ক্ষমতা। ক্রমশ উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং পশু-প্রবৃত্তির নতুন করে জেগে ওঠার প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও, মোরো ওদের মনের মধ্যে এমন কয়েকটা স্থির-ধারণাকে গেঁথে দিয়েছেন যা ওদের কল্পনাশক্তিকে একেবারে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। 'আইন' নামে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলো প্রতিজ্ঞার সঙ্গে—যা আমি ইতিমধ্যেই ওদের আবৃত্তি করতে শুনেছি—ওদের মনের গভীরে শিকড় মেলে থাকা পশু-প্রকৃতির অনবরত সংঘর্ষ চলে। এই আইনগুলো ওরা যেমন বারবার বলে, তেমনি—আমি দেখেছি—বারবার ভাঙেও বটে। ওরা যাতে রক্তের স্বাদ না পায়, সেদিকে মণ্টগোমেরি এবং মোরো দুজনেই বিশেষ সক্রিয়।

মণ্টগোমেরি বললেন, বিশেষ করে বেড়াল-জাতীয় পশু-মানুষের কাছে রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গেই আইনের বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। তখন ওদের মধ্যে পশুত্বই প্রবল হয়ে ওঠে, ওদের মধ্যে দুঃসাহসের নেশা জাগে। তখন ওরা মরিয়া হয়ে এমন অনেক কাজ করে বসে, যা দিনের বেলায় করার কথা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কথাটা শুনে প্রথম দিন রাতে আমাকে অনুসরণ করতে থাকা সেই চিতা-মানুষটার কথা মনে পড়লো। তবে দ্বীপে আমার এই প্রথম দিকের দিন-

গুলোতে আমি ওদের শুধু লুকিয়ে-চুরিয়েই আইন ভাঙতে দেখেছি এবং তা-ও অন্ধকার নামার পর—দিনের বেলা নিষিদ্ধ তালিকার সম্পর্কে সকলে একটা সমীহ বজায় রাখতো।

এই প্রসঙ্গে আমি এই দ্বীপ এবং তার পশু-মানুষদের সম্পর্কে কয়েকটা সাধারণ তথ্য জানিয়ে রাখি। দ্বীপটার তটরেখা ভগ্ন, নিচু জমি খোলা দরিয়ায় গিয়ে মিশেছে, মোট আয়তন সম্ভবত সাত কি আট বর্গ মাইল।* আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে দ্বীপটার জন্ম, এর তিন দিকে এখন প্রবালের বেষ্টনী। দূর অতীতে যে তীব্র শক্তির আক্ষেপে দ্বীপটার জন্ম হয়েছিলো, আজ শুধু উত্তর দিকে ধোঁয়া-ওঠার কয়েকটা মুখ আর একটা উষ্ণ প্রস্রবনের মধ্যেই তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। তবে এখনও মাঝে-মধ্যে এখানে মৃদু ভূমিকম্প অনুভব করা যায়, মাঝে-মধ্যে বাষ্পের নিদারুণ দমকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি এঁকে-বেঁকে উঠে যায় আকাশের দিকে। মণ্টগোমেরি আমাকে জানালেন, দ্বীপের ওই বিচিত্র অধিবাসীদের সংখ্যা এখন ষাটের কিছু বেশি—তবে এই সংখ্যার মধ্যে যে ছোটো খাটো দানবগুলো আগাছার জঙ্গলে বাস করে এবং যাদের মানুষের আকৃতি দেওয়া হয়নি, তাদের বাদ রাখা হয়েছে।

সব মিলিয়ে মোরো প্রায় একশো কুড়িটা জীব সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছে। তাছাড়া পা-বিহীন সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটার মতো কিছু কিছু জীবকে মেরেও ফেলতে হয়েছে। আমার একটা প্রশ্নের জবাবে মণ্টগোমেরি জানালেন যে এই বিচিত্র জীবগুলোরও সন্তানাদি হয়, কিন্তু সাধারণত তারা বাঁচে না। বাচ্চাগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে মানবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিলো বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বেঁচে থাকলে, মোরো ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে মানুষের আদলে গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে পুরুষের চাইতে মেয়ের সংখ্যা কম এবং 'আইন' অনুসারে যদিও এদের একটি বিয়েই স্বীকৃত, কিন্তু মেয়েরা প্রায়শই লুকিয়ে-চুরিয়ে তা অমান্য করে।

পশু-মানুষদের আকৃতির বিশদ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার চোখ তেমন শিক্ষা কখনও পায়নি—আর তাছাড়া দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আঁকতেও পারি না। তবে সম্ভবত সব চাইতে বেশি করে চোখে পড়ে

* দ্বীপের এই বর্ণনা নোবলস্ দ্বীপের সঙ্গে সব দিক দিয়েই মিলে যায়—চা. এ. প্রেনডিক।

এদের পা এবং দেহের দৈর্ঘ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের অদ্ভুত অভাব। কিন্তু সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা এতোই আপেক্ষিক যে আমার চোখও ওদের দেখে দেখে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং শেষের দিকে আমার নিজের উরুই আমার কাছে অস্বাভাবিক লম্বা বলে মনে হতো। আর একটা লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওদের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং মেরুদণ্ডও বাঁকা। মেরুদণ্ডের যে সৌষ্ঠব মানুষের আকৃতিকে সুন্দর করে তোলে, বনমানুষের মধ্যেও তার নিতান্ত অভাব। ওদের অধিকাংশেরই কাঁধ দুটো কুঁজের মতো উঁচু, হাতের পুরোভাগ অস্বাভাবিক বেঁটে। সামান্য কয়েকজনের মাথায় চুল আছে —অন্তত আমি যতোদিন দ্বীপে ছিলাম, ততোদিন ছিলো।

এর পরেই বিশেষ করে চোখে পড়ে ওদের মুখের বিকৃতি। পশু-মানুষদের প্রায় সকলেরই চোয়ালের হাড় উঁচু, বেয়াড়া ধরণের কান, বিশাল ঠেলে-ওঠা নাক, রোমের মতো অথবা ভীষণ খোঁচা খোঁচা চুল, চোখের রঙ এবং অবস্থান প্রায়শই অদ্ভুত। ওরা কেউই হাসতে পারে না, শুধু বানর-মানুষটা একটু কিচির-মিচির করে হাসার চেষ্টা করে। এই সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বাদ দিলে ওদের মধ্যে মিল অতি সামান্যই—প্রত্যেকের মধ্যেই নিজ নিজ প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়ে গেছে। ওদের দেখেই বোঝা যায় আগেকার পশু-জীবনে ওরা কে কি ছিলো। মানুষের বিকৃত আকৃতি ওদের ভেতরকার চিতা, ষাঁড়, শুয়োর বা অন্য পশু কিংবা পশুদের আদল লুকিয়ে রাখতে পারেনি। ওদের কণ্ঠস্বরের মধ্যেও প্রচণ্ড প্রভেদ। হাতগুলো প্রায়শই বিকৃত। যদিও কারুর কারুর হাতের অপ্রত্যাশিত মানুষালি গড়ন আমাকে অবাক করে দিয়েছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে আঙুলের সংখ্যা কম, নখগুলো বেখাপ্পা।

ওদের মধ্যে সব চাইতে দুর্দান্ত দুটো পশু-মানুষ হচ্ছে, আমার সেই চিতা-মানুষ আর হায়না এবং শুয়োরের সংমিশ্রণে তৈরি একটা প্রাণী। কিন্তু ষাঁড়-মানুষ তিনটে ওদের চাইতে লম্বা-চওড়া। এদের পরে আসছে রুপোলি রোমময় প্রাণীটা —যে আইন পড়ায়, মলিং এবং বনমানুষ ও ছাগলের সংমিশ্রণে তৈরি একটা মজাদার প্রাণী। এ ছাড়াও আছে তিনটে শুয়োর-মানুষ, একটা শুয়োর-মানবী, একটা মাদী ঘোড়া-গণ্ডার মেশানো প্রাণী এবং আরও কয়েকটা মেয়ে-প্রাণী যাদের উৎস সম্পর্কে আমি ঠিক নিশ্চিত নই। দ্বীপে বেশ কয়েকটা নেকড়ে-মানুষ, একটা ষাঁড়-ভালুক এবং একটা সেন্ট বার্ণার্ড কুকুর-মানুষও আছে। বানর-মানুষের বর্ণনা আমি আগেই দিয়েছি। আর আছে হতকুৎসিত দেখতে (সেই সঙ্গে বদগন্ধ-

ওলা) একটা বুড়ি খেঁকশেয়ালী-ভালুক, যাকে প্রথম থেকেই আমার অপছন্দ। বুড়িটা নাকি আইনের প্রচণ্ড ভক্ত। ছোটো ছোটো প্রাণীগুলোর গায়ে চিত্রবিচিত্র দাগ—আমার ছোট্ট শ্লথটা এদের মধ্যেই একজন।

প্রথম প্রথম পশু-মানুষগুলোকে দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠতাম, মনে হতো ওরা এখনও পশুই রয়ে গেছে। কিন্তু নিজের অজান্তেই আমি একটু অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। তাছাড়া ওদের প্রতি মণ্টগোমেরির মনোভাবেও আমি খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলাম। দীর্ঘদিন ওদের সঙ্গে থাকায় মণ্টগোমেরি ওদের প্রায় স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে করতেন—লণ্ডনের দিনগুলোকে তাঁর নিজেরই বোধ হয় এক অপরূপ অসম্ভব অতীত বলে মনে হতো। বছরে মাত্র একবার তাকে আফ্রিকায় এক পশু-ব্যবসায়ীর কাছে যেতে হয়। সমুদ্রের ধারে সেই ইসপাহানি বর্ণসঙ্করদের গ্রামে প্রথম শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে। উনি বললেন, প্রথম দেখায় পশু-মানুষদের আমার যেমন অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিলো, জাহাজের লোকগুলোকে দেখে তাঁরও মনের অবস্থা ঠিক তেমনি হয়েছিলো—মনে হয়েছিলো ওদের পাগুলো অস্বভাবিক লম্বা, মুখ চ্যাপটা, কপাল প্রকট, সন্দেহকুটিল, বিপজ্জনক আর নিষ্ঠুর। সত্যি বলতে কি, মানুষ উনি পছন্দ করেন না। ওঁর ধারণা, উনি আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন বলেই আমাকে ওঁর ভালো লেগেছিলো।

আমার ধারণা, রূপান্তরিত পশুগুলো এবং তাদের জীবনধারা সম্পর্কে মণ্টগোমেরির মনে খানিকটা অনৈতিক সহানুভূতি ছিলো—কিন্তু প্রথম দিকে আমার কাছে তিনি তা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

পশু-মানুষদের মধ্যে যাকে আমি প্রথম দেখি, সে হচ্ছে মণ্টগোমেরির সেই কালো-মুখো চাকরটা, যার নাম মলিং। মলিং কিন্তু অন্য পশু-মানুষদের সঙ্গে একত্রে থাকতো না, সে থাকতো চত্বরের পেছন দিকে একটা ছোট্ট ঝুপড়িতে। মলিং বানর-মানুষটার মতো অতোখানি বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু অনেক বেশি শান্ত। পশু-মানুষদের মধ্যে তার চেহারাটাই মানুষের সব চাইতে কাছাকাছি। মণ্টগোমেরি তাকে রান্নাবান্না, এমন কি ঘর-গেরস্থালীর কাজও শিখিয়েছিলেন। মোরোর ভয়ঙ্কর কুশলতার এক জটিল নিদর্শন এই মলিং। ভালুকের সঙ্গে কুকুর ও ষাঁড় মিলিয়ে প্রচণ্ড যত্ন নিয়ে মোরো ওঁকে তৈরি করেছিলেন। মণ্টগোমেরির প্রতি মলিঙের ব্যবহারে এক আশ্চর্য শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ পেতো। মাঝেমাঝে মণ্টগোমেরি তা লক্ষ্য করতেন, ওকে পিঠ চাপড়ে আদর করতেন, রসিকতা করে

ওকে নানান মজার নামে ডাকতেন আর মলিং তাতেই ভীষণ আনন্দ পেতো। আবার মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহারও করতেন—বিশেষ করে হুইস্কি খেয়ে অনেক সময়েই তিনি মলিঙকে লাথি ঘুঁষি মারতেন, ওর দিকে নুড়ি-পাথর ছুঁড়তেন। কিন্তু মণ্টগোমেরি যেমন ব্যবহারই করুন না কেন, মলিং সর্বদাই মণ্টগোমেরির কাছাকাছি থাকতে সব চাইতে বেশি ভালোবাসতো।

আগেই বলেছি, পশু-মানুষদের দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। প্রথম দিকে যেগুলো আমার কাছে অস্বাভাবিক আর হতকুৎসিত বলে মনে মতো, দ্রুত সেগুলোই যেন স্বাভাবিক আর সাধারণ হয়ে উঠলো। আমার ধারণা, আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটা জিনিসেই পারিপার্শ্বিকের ছাপ পড়ে। স্বাভাবিক মানুষ বলতে যা বোঝায়, মণ্টগোমেরি বা মোরো কেউই তা নন। আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া ষাঁড়-মানুষদের দেখে আমি নিজেকেই প্রশ্ন করতাম, এদের সঙ্গে ক্ষেত-খামার থেকে খেটে ফেরা গ্রাম্য-মানুষদের প্রভেদ কোথায়। আবার খেঁকশেয়ালি-ভালুকের ধূর্ত মুখ আর হাবভাব দেখে মনে হতো, যেন অতীতে কোনো এক শহরের অলি-গলিতে আমি ওকে দেখেছিলাম।

তবু প্রায়ই আমি ওদের মধ্যে পশুত্বের সুনিশ্চিত প্রকাশ দেখতে পাই। কখনও দেখি, কোনো গুহামুখের কাছে উবু হয়ে বসে কোনো কুৎসিত-কুঁজো চেহারার পশু-মানুষ দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে হাই তুলছে—ছুরির ফলার মতো ঝকঝক করছে তার কৃন্তক আর শ্বদন্তগুলি। আবার কখনও হয়তো কোনো সঙ্কীর্ণ পথে অদ্ভুত সাদা-পোশাক-পরা কোনো বিচিত্র মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, হয়তো সে তখন এলোমেলো বেপরোয়া দৃষ্টিতে এদিক-সেদিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আচমকা তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাই, (দেখেই গা গুলিয়ে ওঠে) তার চোখের মণি দুটো লম্বাটে অথবা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, বাঁকা বাঁকা অদ্ভুত নখ দিয়ে সে তার বেঢপ পোশাকটাকে আঁকড়ে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার জানিয়ে রাখি, যার সঠিক কারণ আমি আজ অব্দি বুঝে উঠতে পারিনি। দ্বীপে থাকার সময় প্রথম দিকের দিনগুলোতে আমি লক্ষ্য করেছি, এই অদ্ভুত প্রাণীগুলো—আমি মেয়ে-প্রাণীদের কথাই বলতে চাইছি—নিজেদের শারীরিক বিকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তার ফল স্বরূপ নিজেদের পোষাক-আশাকের সৌষ্ঠব এবং সুরুচি সম্পর্কে তারা এতোটা সচেতনতা দেখায় যা মানুষের চাইতেও বেশি।

রক্তের আস্বাদ

লেখক হিসেবে অনভিজ্ঞতা আমাকে কাহিনীর সূত্র থেকে দূরে নিয়ে গেছে। সেদিন প্রাতরাশের পর মণ্টগোমেরি আমাকে দ্বীপের অন্য প্রান্তে ধোঁয়া-মুখ আর উষ্ণ প্রস্রবণের উৎসটা দেখাতে নিয়ে গেলেন। আগের দিন ওই উষ্ণ জলের ফোয়ারাতেই আমি ভুল করে নেমে পড়েছিলাম। আজ আমাদের দুজনের সঙ্গেই চাবুক আর গুলিভর্তি রিভলভার। পাতাভরা বনপথে যেতে যেতে হঠাৎ আমরা একটা খরগোশের চিৎকার শুনতে পেলাম। থমকে দাঁড়িয়ে আমরা কান পেতে রইলাম, কিন্তু আর কিছুই শোনা গেলো না। ফের এগিয়ে চললাম আমরা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটা সম্পূর্ণ মুছে গেলো আমাদের মন থেকে। মণ্টগোমেরি আমাকে কতকগুলো ছোটো ছোটো গোলাপি রঙের প্রাণী দেখালেন। ওদের পেছনের পা দুটো লম্বা, লাফাতে লাফাতে ওরা জঙ্গলে ঢুকে গেলো। মণ্টগোমেরি জানালেন, পশু-মানুষদের ছানা থেকে ওদের তৈরি করা হয়েছে। উনি ভেবে-ছিলেন, ওদের দিয়ে মাংসের সমস্যাটা মিটবে। কিন্তু খরগোশের মতো এদেরও বাচ্চা খেয়ে ফেলার স্বভাবের জন্যে তাঁর সে উদ্দেশ্যটা মাটি হয়ে গেছে। এদের কয়েকটাকে আমি আগেও দেখেছি—একবার সেই চাঁদনি রাতে চিতা-মানুষটার কাছ থেকে পালাবার সময়, আর একবার গতকাল মোরোর তাড়া খেয়ে। আমাদের হাত এড়াতে গিয়ে হঠাৎ ওদের মধ্যে একটা প্রাণী লাফাতে লাফাতে ঝড়ে লুটিয়ে পড়া একটা গাছের শেকড় উপড়ে তোলা গর্তে পড়ে গেলো। উঠে আসার আগেই আমরা তাকে ধরে ফেললাম। প্রাণীটা বেড়ালের মতো ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে আমাদের আঁচড়াতে লাগালো, সজোরে পেছনের পা দুটো ছুঁড়তে লাগলো এবং কামড়াবারও চেটা করলো—কিন্তু নরম দাঁত বলে আমরা যন্ত্রণাহীন মৃদু চিমটির মতো অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রাণীটাকে আমার দিব্যি সুন্দর বলেই মনে হলো। মণ্টগোমেরি যখন বললেন যে এরা দাঁত দিয়ে ঘাস কাটে না এবং এদের স্বভাবও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তখন আমার মনে হলো, খরগোশের বদলি হিসেবে এদের সহজেই পার্কে-বাগানে রাখা যেতে পারে।

পথে যেতে যেতে দেখলাম, একটা গাছের গুঁড়িতে ফালা ফালা হয়ে থাকা গভীর দাগ। মণ্টগোমেরি জিনিসটা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'গাছেতে নখ

আঁচড়ানো নয়, তাই তো আইন। মনে হচ্ছে অনেকেই তা মেনে চলছে!' এর পরেই সম্ভবত ছাগল-মানুষ আর বানর-মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। ছাগল-মানুষটা যেন মোরোর পুরাণ-পাঠের এক টুকরো স্মৃতিচিহ্ন। তার মুখের অভিব্যক্তি মেষের মতো—অনেকটা যেন আদিম হিব্রু মানুষ—কণ্ঠস্বরেও ভেড়ার কর্কশ আওয়াজ। আমাদের পেরিয়ে যাবার সময় সে সীমের মতো কোনো একটা ফলের খোসা চিবোচ্ছিলো। ওরা দুজনেই মণ্টগোমেরিকে অভিবাদন জানিয়ে বললো, 'নমস্কার, দ্বিতীয় চাবুকধারী!'

'এখন একজন তৃতীয় চাবুকধারীও এসেছেন,' মণ্টগোমেরি বললেন, 'কাজেই তোমরা ঠিক মতো থাকবে!'

'ওঁকে কি তৈরি করা হয়নি?' বানর-মানুষ জিগেস করলো, 'উনি বলেছিলেন ...উনি বলেছিলেন ওঁকেও তৈরি করা হয়েছে।'

ছাগল-মানুষ অবাক-চেখে আমার দিকে তাকালো।

'তৃতীয় চাবুকধারী কাঁদতে কাঁদতে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিলেন। ওঁর মুখ সরু আর সাদা।'

'ওঁর একটা সরু লম্বা চাবুক আছে,' মণ্টগোমেরি বললেন।

'গতকাল ওঁর রক্ত বেরুচ্ছিলো, উনি কাঁদছিলেন,' ছাগল-মানুষ বললো। 'আপনার কক্ষণো রক্ত বেরোয় না, আপনি কাঁদেন না। প্রভুরও রক্ত বেরোয় না, তিনিও কাঁদেন না!'

'চুপ কর, হতচ্ছাড়া!' মণ্টগোমেরি বললেন, 'ঠিকমতো না চললে তোরই রক্ত ঝরবে, তুই-ই কাঁদবি।'

'ওঁর পাঁচটা আঙুল,' বানর-মানুষ বলে, 'উনি আমার মতো পাঁচ-আঙুলে মানুষ।'

'আসুন, প্রেনডিক,' মণ্টগোমেরি আমার হাত ধরে টানলেন।

আমি ওঁর সঙ্গে যেতে যেতে দেখলাম, পশু-মানুষ দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে আর পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

ছাগল-মানুষ বললো, 'উনি কথা বলেন না। মানুষ কথা বলতে পারে।'

'কাল উনি আমাকে জিগেস করছিলেন, কি খাবেন।' বানর-মানুষ বললো, 'উনি জানতেন না, কি খাবেন।'

তারপর ওরা কি বললো শুনতে পেলাম না, শুধু ছাগল-মানুষের হাসির আওয়াজ শুনলাম।

ফেরার পথে আমরা একটা মরা-খরগোশ দেখতে পেলাম। হতভাগ্য ছোট্ট প্রাণীটার লাল শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, বেশ কয়েকটা পাঁজরা সাদা হয়ে গেছে এবং মেরুদণ্ডটাও নিঃসন্দেহে চিবোনো হয়েছিলো। দৃশ্যটা দেখেই মণ্টগোমেরি থমকে দাঁড়ালেন।

'হে ভগবান!' নিচু হয়ে এক টুকরো হাড় তুলে নিলেন উনি। তারপর হাড়টা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে ফের বললেন, 'হে ভগবান! কি অর্থ হতে পারে এর?'

'আপনাদের এখানকার কোনো মাংসাশী প্রাণীর আগেকার অভ্যেসের কথা মনে পড়ে গেছে,' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম। 'এই মেরুদণ্ডটাকে চিবোনো হয়েছিলো।'

মণ্টগোমেরি ফ্যাকাসে মুখে খানিকক্ষণ হাড়ের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না।'

'প্রথম যেদিন এখানে এলাম, সেদিনই আমি এ ধরণের একটা দৃশ্য দেখেছিলাম।'

'দেখেছিলেন! কি দেখেছিলেন?'

'মাথা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলা একটা খরগোশ।'

'যেদিন আপনি এখানে এলেন?'

'হ্যাঁ, যেদিন আমি এলাম। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখেছিলাম... ...চত্বরের পেছন দিকটায় জঙ্গলের মধ্যে। মাথাটা দেহ থেকে সম্পূর্ণ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিলো।'

মণ্টগোমেরি নিচু স্বরে একটা দীর্ঘ শিস দিলেন।

'তার চাইতেও বড়ো কথা, আপনাদের তৈরি করা কোন্ দানবটা কাজটা করেছিলো, সে সম্পর্কেও আমার একটা ধারণা আছে। অবিশ্যি সেটা আমার সন্দেহ মাত্র। কিন্তু মৃত খরগোশটাকে দেখার আগে আমি আপনাদের একটা দানবকে নদীতে জল খেতে দেখেছিলাম।'

'জল শুষে খাচ্ছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'জল শুষে খাওয়া নয়, তাই তো আইন! মেরো কাছে না থাকলে অনেকেই দেখছি দারুণ আইন মেনে চলে—তাই না?'

'সেদিন সেই জন্তুটাই আমাকে তাড়া করেছিলো।'

'ঠিক তাই, মাংসাশী প্রাণীরা তা-ই করে। শিকার করার পর ওরা জল

খায়। রক্তের আস্বাদ—বুঝতেই পারছেন !···আচ্ছা, জন্তুটা দেখতে কেমন বলুন তো ? ফের তাকে দেখলে চিনতে পারবেন ?'

মৃত খরগোশটার দেহের অবশিষ্ট অংশটা দু-পায়ের মাঝখানে রেখে মণ্টগোমেরি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। আমাদের ঘিরে রাখা শ্যামল বনানী, ছায়াময় অঞ্চল আর সন্দেহজনক ঝোপঝাড়ের দিকে ইতস্তত ঘুরতে লাগলো তাঁর চঞ্চল চোখ দুটো। 'রক্তের আস্বাদ', ফের বললেন উনি। তারপর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে কার্তুজগুলো পরীক্ষা করে, আবার সেটা পকেটে রেখে দিলেন।

'মনে হয় প্রাণীটাকে আমি দেখলে চিনতে পারবো। আমি তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম। তার কপালে একটা চমৎকার কালশিরে থাকার কথা।'

'কিন্তু তারপর আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে সে-ই খরগোশটাকে মেরে ছিলো।' মণ্টগোমেরি বললেন, 'এখন মনে হচ্ছে খরগোশগুলোকে আমি এ দ্বীপে না আনলেই ভালো করতাম।'

আমি ওখান থেকে সরে পড়তে চাইছিলাম। কিন্তু তখনও মণ্টগোমেরি সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খরগোশটার কাছে দাঁড়িয়ে কিসব আকাশ-পাতাল চিন্তা করছেন। এমনিতেই আমি যেটুকু এগিয়ে গিয়েছিলাম সেখান থেকে খরগোশটার অব-শিষ্টাংশটুকু চোখে পড়ে না। ওখান থেকেই ডাকলাম, 'চলে আসুন !'

মণ্টগোমেরি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে উনি প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'বুঝলেন, যে সমস্ত প্রাণী ডাঙাতে হেঁটে চলে বেড়ায় তাদের খাওয়া নিষেধ—ওদের মনে এমনি একটা বদ্ধমূল ধারণা থাকার কথা। কিন্তু কোনো পশু যদি দৈবক্রমে রক্তের আস্বাদ পেয়ে গিয়ে থাকে···'

কিছুক্ষন আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম। মণ্টগোমেরি নিজের মনেই বললেন, 'ভেবে পাচ্ছি না, কি এমন ঘটতে পারে—কেন এমন হলো।' তারপর ফের বললেন, 'সেদিন আমি একটা বোকামো করে ফেলেছি। আমার ওই চাকরটা···আমি ওকে দেখিয়ে দিয়েছি, কি করে খরগোশের ছাল ছাড়িয়ে মাংস রান্না করতে হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, জানেন···তখন দেখলাম, ও নিজের হাত চাটছে।···তখন কথাটা আমার মনেও আসেনি।' তারপর আবার বললেন, 'নাঃ, এ সমস্ত বন্ধ করতেই হবে। মোরোকে গিয়ে সবকিছু বলবো।'

'ওই এক কথা ছাড়া বাড়ি ফেরার পথে মণ্টগোমেরি যেন আর কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। মোরো বিষয়টাকে তাঁর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণভাবে নিলেন।

কাজেই ওঁদের দুজনকার সুস্পষ্ট আতঙ্ক যে আমার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিলো, তা আর বলা নিষ্প্রয়োজন।

মোরো বললেন, 'আমাদের একটা উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। দোষী যে চিতা-মানুষ, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা আমরা প্রমাণ করবো কি করে? মণ্টগোমেরি, তুমি আপাতত কিছুদিন মাংস খাওয়ার ইচ্ছেটা স্থগিত রাখলেই পারতে—তাহলে আর এ সমস্ত উত্তেজনামূলক ঘটনা ঘটতো না। কে জানে, হয়তো এই থেকেই আমরা কোনো বড়ো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো।'

'আমি একটা নিরেট গর্দভ,' মণ্টগোমেরি বললেন। 'কিন্তু যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন তো আর কিছু করার নেই। তবে আপনিও বলেছিলেন যে এখন মাংস খাওয়া চলতে পারে!'

'আমাদের এখুনি ব্যাপারটা গিয়ে দেখতে হবে। কোনো গোলমাল শুরু হলে মলিং নিজেকে সামলাতে পারবে আশা করি?'

'মলিং সম্পর্কে আমি ঠিক ততোটা নিশ্চিত নই। ওকে আরও একটু ভালো করে বোঝা দরকার।'

সেদিন বিকেলে মোরো, মণ্টগোমেরি, আমি আর মলিং—চারজনে মিলে দ্বীপের অন্যপ্রান্তে গিরিখাতের সেই কুটিরগুলোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা তিনজনেই সশস্ত্র। মলিঙের সঙ্গে কাঠ-কাটার ছোট্ট কুড়ুলটা আর দড়ির একটা কুণ্ডলি। মোরোর কাঁধে ঝুলছিলো বিশাল একটা শিঙা।

'এবারে আপনি সমস্ত পশু-মানুষদের এক জায়গায় জড়ো হতে দেখবেন।' মণ্টগোমেরি বললেন, 'সে এক চমৎকার দৃশ্য!'

সারাটা রাস্তা মোরো কোনো কথা বললেন না, তাঁর ভারি মুখখানা বিষণ্ণ-গম্ভীর। গিরিখাতটা পেরিয়ে গেলাম আমরা। ঠিক নিচেই বয়ে চলেছে উষ্ণ জলের ধারা। দুধারে বেতবনভরা আঁকা বাঁকা পথটা পেরিয়ে আমরা একটা বিশাল খোলা-জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। সমস্ত জায়গাটাতে কি একটা হলদে রঙের গুঁড়োর পুরু আস্তরণ—সম্ভবত গন্ধক। আগাছাভরা তীরের ওধারে ঝলমলে সমুদ্র। খোলা রঙ্গমঞ্চের মতো একটা জায়গায় পৌছে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। তারপরেই মোরোর শিঙার আওয়াজে ঝিমুঝিম অপরাহ্ণের ঘুমঘুম স্তব্ধতাটুকু খানখান হয়ে ভেঙে পড়লো। ভদ্রলোকের ফুসফুস দুটো নিশ্চয়ই খুব বলিষ্ঠ। আওয়াজটা তীক্ষ্ণতর হতে হতে প্রতিধ্বনির সঙ্গে মিশে গিয়ে অবশেষে কান-

ফাটানোর স্তরে গিয়ে পৌঁছালো। মোরো 'আ!' বলে, শিঙাটা ফের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হলদে বেতবনের ভেতরে ছুটোপুটির শব্দ শোনা গেলো, কণ্ঠস্বর ভেসে এলো জলার ওধারে ঘন সবুজ জঙ্গলটা থেকে। তারপর গন্ধক বেছানো প্রান্তরটার তিন-চার জায়গা থেকে পশু-মানুষদের কদাকার মূর্তিগুলো দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে। গাছপালা অথবা বেতবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওরা যখন একে একে তপ্ত ধুলোর ওপর দিয়ে অদ্ভুত বিকৃত ভঙ্গিমায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছিলো, তখন আমি কিছুতেই আমার ভেতরে আতঙ্কের শিহরণ চেপে রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু মোরো আর মণ্টগোমেরি যথেষ্ট শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন এবং ফলে বাধ্য হয়ে আমাকেও ওঁদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। পায়ের খুরে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে প্রথমে এলো ছাগল-মানুষ—মাটিতে দেহের ছায়া পড়লেও অদ্ভুত অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিলো তাকে। তারপর বেতবন থেকে খড় চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে এলো অতিকায় এক দানব—ঘোড়া আর গণ্ডারের মিশ্রণে তার সৃষ্টি। এরপরে এলো শুয়োর-নারী আর দুটো নেকড়ে-নারী। তারপর লাল মুখে লাল চোখওলা খেঁকশেয়ালী আর ভালুকের মিশেল সেই ডাইনীটা। সকলেই ব্যতিব্যস্ত আর উদগ্রীব। মোরোর কাছাকাছি হতেই ওরা গোলামের মতো মাথা নিচু করে যে যার সুরে আইনের শেষ অংশটুকু বলতে শুরু করলো:

'আঘাত দেবার হাত—সে যে তাঁর,
আরাম দেবার হাত—সে-ও তাঁর।'

আমাদের কাছ থেকে গজ তিরিশেক দূরে ওরা থেমে দাঁড়ালো—তারপর হাঁটু আর কনুইতে ভর রেখে বিনত ভঙ্গিতে বসে, নিজেদের মাথায় হলুদ-ধুলোগুলো ছড়াতে লাগলো। সম্ভব হলে আপনারা দৃশ্যটা কল্পনা করে দেখুন। বিকলাঙ্গ কালো-মুখো পরিচারকটিকে নিয়ে নীল-পোশাক পরা আমরা তিনটি মানুষ এক উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। নীল আকাশ থেকে জ্বলন্ত সূর্যের আলো দীপ্ত করে তুলছে প্রান্তরের হলুদ ধুলো—আর আমাদের বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বসে হাত-পা নাড়তে থাকা একদল অপার্থিব দানব। দুর্বোধ্য অভিব্যক্তি আর আশ্চর্য অঙ্গভঙ্গির কথা বাদ দিলে ওদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখতে প্রায় মানুষের মতো, কেউ কেউ যেন বিকলাঙ্গ, আবার কেউ কেউ এতোই বিকৃত যে অর্থহীন স্বপ্নের অবাস্তব দানব ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কিছুরই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। দূরে—একদিকে সারি সারি বেতবন, অন্য দিকে পাম গাছের ঘন অরণ্য

গিরিখাতের কুটিরগুলোর কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমাদের উত্তর দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের অস্পষ্ট দিগন্ত রেখা।

'বাষট্টি, তেষট্টি' মোরো গোনা শেষ করে বললেন, 'আরও চারজন আছে।'

'চিতা-মানুষকে দেখছি না তো!' আমি বললাম।

মোরো ফের তাঁর বিশাল শিঙাটাতে ফুঁ দিলেন। শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পশু-মানুষরা একযোগে ধুলোয় লুটোপুটি খেতে লাগলো। এবং তারপরেই চোরের মতো বেতবন থেকে বেরিয়ে এলো চিতা-মানুষ—মোরোর পেছন দিক দিয়ে অন্য পশু-মানুষদের সঙ্গে মিশে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো সে। আমি দেখলাম, ওর কপালে কালশিরের দাগ। সবার শেষে এসে পৌঁছলো ছোট্ট বানর-মানুষটা। যারা আগে এসেছিলো, গরম আর লুটোপুটি খাওয়ার ক্লান্তিতে তারা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো বানর-মানুষের দিকে।

'থামো,' উঁচু গলায়, গম্ভীর স্বরে মোরো বললেন।

পশু-মানুষরা স্তুতিগান বন্ধ করে মাটিতে থেবড়ে বসলো।

'আইন-শিক্ষক কোথায়?' মোরো জিগেস করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধূসর রঙের রোমশ দানবটা মাটিতে মুখ লুটিয়ে ওঁকে অভিবাদন জানালো।

'আইন বলো।'

সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাঁটু-মুড়ে বসে ডাইনে-বাঁয়ে হেলে দুলে, প্রথমে ডান হাত তারপর বাঁ হাতে করে গন্ধক তুলে ছড়াতে ছড়াতে ফের সুর করে সেই শ্লোকগুলো আওড়াতে শুরু করলো।

ওরা 'মাছ-মাংস খাওয়া নয়, তাই তো আইন—'অব্দি বলতেই মোরো নিজের দীর্ঘ একখানা শুভ্র বাহু ওপরের দিকে তুলে ধরলেন, 'থামো!'

ওরা নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে রইলো। আমার মনে হলো ওরা সকলেই জানে এবারে কি হবে, সকলেই তাই ভীত সন্ত্রস্ত। আমি ওদের অদ্ভুত মুখগুলোকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ওদের জড়োসড়ো ভঙ্গিমা আর জ্বলজ্বলে চোখে চোরাআতঙ্ক দেখে ভেবেই পেলাম না, কি করে ওদের আমি মানুষ বলে মনে করেছিলাম।

'ওই আইনটা ভাঙা হয়েছে,' মোরো বললেন।

'রক্ষা নেই,' রুপোলি চুলওলা প্রাণীটা বললো।

'কেউ রক্ষা পায় না,' সমস্বরে আওয়াজ তুললো হাঁটুমুড়ে বৃত্তাকারে বসে থাকা পশু-মানুষের দল।

'কে সে?' চাবুকে সপাং করে একটা আওয়াজ তুলে একে একে ওদের মুখ-

গুলোকে লক্ষ্য করতে লাগলেন মোরো। আমার মনে হলো, হায়না-মানুষের মুখটা যেন বিষণ্ণ। চিতা-মানুষেরও সেই একই অবস্থা। সীমাহীন নির্যাতনের স্মৃতি আর আতঙ্ক নিয়ে মাথা নুইয়ে থাকা চিতা-মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে মোরো যেন থমকে গেলেন। তারপর বজ্রের মতো গম্ভীর গলায় ফের প্রশ্ন করলেন, 'কে সে?'

'যে আইন ভাঙে সে শয়তান,' আইন-শিক্ষক বললো।

মোরো চিতা-মানুষের চোখের দিকে তাকালেন। মনে হলো উনি বুঝি তার অন্তরাত্মাটাকেও বাইরে টেনে আনবেন।

'আইন যে ভাঙে…'চিতা-মানুষের দিক থেকে চোখ তুলে নিয়ে মোরো আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন। মনে হলো ওঁর কণ্ঠস্বরে এক উচ্ছল আনন্দের স্পর্শ লেগেছে।

'সে যন্ত্রণা-ঘরে ফিরে যায়,' সকলে একযোগে বলে উঠলো, 'প্রভু, সে আবার যন্ত্রণা-ঘরে ফিরে যায়!'

'যন্ত্রণা-ঘরে ফিরে যায়…আবার যন্ত্রণা-ঘরে ফিরে যায়,' বানর-মানুষ কলকল করে বললো। মনে হলো কথাটা শুনে সে খুব মজা পেয়েছে।

'শুনতে পেয়েছো?' মোরো মুখ ঘুরিয়ে ফের অপরাধীর দিকে তাকালেন, 'কি হে বন্ধু, শুনেছো কথাটা?'

মোরোর দৃষ্টি থেকে ছাড়া পেয়ে চিতা-মানুষ ইতিমধ্যেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। এবারে সে ঝকঝকে বিশাল দাঁতগুলোকে বের করে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তার উৎপীড়কের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি সুনিশ্চিত, সীমাহীন নির্যাতনের উন্মাদ আশঙ্কাই চিতা-মানুষকে এভাবে আক্রমণের প্ররোচনা জুগিয়েছে। মনে হলো, তিন সারি দানবের পুরো বৃত্তটাই আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আমি রিভলভারটা টেনে বের করলাম। তারপরেই দুজনার মুখোমুখি সংঘর্ষ। তাকিয়ে দেখি, চিতা-মানুষের আঘাতে মোরো পেছনে ছিটকে পড়লেন। চারদিকে হিংস্র চিৎকার আর গর্জন…সবাই দ্রুত ছুটে আসছে আমাদের দিকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে।

চিতা-মানুষের হিংস্র মুখটা চকিতে আমার মুখের কাছ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো, তার ঠিক পেছনেই মলিং। লক্ষ্য করলাম হায়না-শুয়োরের হলদে চোখ দুটো উত্তেজনায় ঝকঝক করছে—ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সে আমাকে আক্রমণ করবে বলে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছে। হায়না-শুয়োরটার কুঁজো-পিঠের পেছন

থেকে মুখ বাড়িয়ে ছাগল-মানুষও আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। হঠাৎ আমি মোরের পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেলাম—একটা গোলাপি আলোর ঝলকানি ছুটে গেলো সামনের দিকে। মনে হলো সকলেই ওই আলোর রেখাটা লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে এবং পরমুহূর্তেই দেখি আমিও ওদের গতির আকর্ষণে ছুটছি, আমিও চিৎকৃত জনতার অংশ হয়ে গেছি, আমিও অনুসরণ করছি পলায়নপর চিতা-মানুষটাকে।

এই অব্দিই আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি। কিন্তু চিতা-মানুষ মোরোকে আঘাত করার পরেই আমার সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো। খেয়াল হতে দেখি, আমিও সবেগে ছুটছি।

সবার আগে আগে ছুটছিলো মলিং। তার পেছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটে যাচ্ছিলো নেকড়ে-নারীরা—তখনই তাদের জিভগুলো লকলকিয়ে ঝুলে পড়েছে। তাদের পেছনে উত্তেজনায় চিৎকৃত শুয়োর-মানুষের দল এবং মুখে গ্যাজলা-ওঠা দুটো ষাঁড়-মানুষ। এদের পেছনে এক দল পশু-মানুষের সঙ্গে রয়েছেন স্বয়ং মোরো—তাঁর বড়ো-কানাওলা টুপিটা মাথা থেকে যেন কোথায় উড়ে গেছে, হাতে রিভলভার, মাথার লম্বা লম্বা সাদা চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো। হায়না-শুয়োরটা আমার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশাপাশি ছুটছিলো আর চোরা-চোখে মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। বাদবাকি পশু-মানুষরা পায়ে দুপদাপ শব্দ তুলে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছিলো আমাদের পেছন পেছন।

লম্বা লম্বা বেতগাছগুলোকে ভেদ করে চিতা-মানুষটা দুরন্ত বেগে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো—বেতগুলো সবেগে ছিটকে এসে আঘাত করলো মলিঙের মুখে। আমাদের পেছনের দলটার সবাই ঝোপটার কাছে গিয়ে দেখি, সামনের পথটা একেবারে পদদলিত হয়ে রয়েছে। প্রায় সিকি মাইল পথ এভাবে চলার পর আমরা একটা ঘন জঙ্গলের কাছে গিয়ে পৌছলাম। এবারে আমাদের গতিবেগ ভীষণ কমে গেলো—ডালপালায় লেগে মুখ ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো, দড়ির মতো অসংখ্য লতা জড়িয়ে ধরতে লাগলো আমাদের চিবুক আর পায়ের গোড়ালি, কাঁটাগাছে লেগে ছিঁড়ে যেতে লাগলো পোশাক-আশাক এমন কি আমাদের মাংসপেশী পর্যন্ত।

'এর ভেতর দিয়ে সে চার হাত-পায়ে ছুটে গেছে,' আমাদের ঠিক সামনে থেকে মোরো হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন।

'কেউ রক্ষা পায় না,' শিকারের আনন্দে নেকড়ে-ভালুক আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

এবারে ফের আমরা পাথুরে-পথ ধরে ছুটতে শুরু করলাম। হঠাৎ দেখি, চিতা-মানুষটা চার হাত-পায়ে ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। নেকড়ে-মানুষরা দৃশ্যটা দেখে আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলো। চিতা-মানুষের পরনে তখনও মানুষের মতো পোশাক, দূর থেকে মুখটাও মানুষের মতো মনে হয়। কিন্তু একমাত্র তাড়া-খাওয়া পশুরাই ওমনি করে চার-হাত-পায়ে ঘাড় গুঁজে ছোটে। কাঁটায় ভরা হলদে ফুলের কতকগুলি ঝোপকে একলাফে টপকে সে কোথায় যেন ফের উধাও হয়ে গেলো।

ততোক্ষণে আমাদের মধ্যে অনেকেরই গতিবেগ কমে এসেছে। লক্ষ্য করলাম এবারে আমরা একটা সারি বেঁধে এগুচ্ছি। হায়না-শুয়োর তখনও আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে, ছুটতে ছুটতে আমাকে লক্ষ্য করছে আর মাঝেমাঝেই নাক কুঁচকে হাসছে।

টিলাটার ধার বরাবর এসে চিতা-মানুষ বুঝতে পারলো, সে অন্তরীপের দিকে এগুচ্ছে—প্রথম দিন রাত্রে যেখান থেকে সে আমার পিছু নিয়েছিলো—এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে তীব্র গতিতে আগাছার জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। কিন্তু মণ্টগোমেরি ওকে দেখতে পেয়ে, ফের সেদিকে তাড়া করে চললেন। অতএব হাঁফাতে হাঁফাতে, পাথরে-নুড়িতে ঠোক্কর খেয়ে, কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, গাছপালা-বেতবনের বাধা ঠেলে আমিও আইন ভঙ্গকারী চিতা-মানুষের পেছন পেছন নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে চললাম—হিংস্র হাসি হাসতে হাসতে হায়না-শুয়োরও ছুটতে লাগলো আমার পাশাপাশি। আমি তখন টলছি, আমার মাথা ঘুরছে, হৃৎপিণ্ডটা যেন খোঁচা মারছে পাঁজরার খাঁচায়, ক্লান্তিতে আমি মৃতপ্রায়—কিন্তু তবু পেছিয়ে পড়তে ভরসা পাচ্ছি না, পাছে এই ভয়ঙ্কর সঙ্গীটির সঙ্গে আমি একা হয়ে পড়ি। তাই অসম্ভব ক্লান্তি আর ক্রান্তীয় অপরাহ্ণের অসম্ভব গরম সত্ত্বেও আমি টলতে টলতে এগিয়ে চললাম।

অবশেষে আমাদের চলার গতি কমে এলে। হতভাগা জীবটাকে আমরা দ্বীপের একটা ধারে কোণঠাসা করে ফেললাম। হাতে চাবুক নিয়ে মোরো সবার আগে আগে এগুতে লাগলেন, তাঁর পেছনে চিৎকার করতে করতে ধীর পায়ে এগুতে লাগলাম আমরা সবাই। কিন্তু চিতা-মানুষ নিঃশব্দে সেই ঝোপটার আড়ালেই লুকিয়ে রইলো, প্রথম দিন রাতে যেখান থেকে আমি তার ভয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

সবাই মিলে ঝোপটাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলতে যেতেই মোরো চিৎকার করে বললেন, 'সাবধান!'

'সাবধান, যেন ছুটে বেরিয়ে না যায়—' ঝোপের অন্য দিক থেকে মণ্টগোমেরির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আমি তখন ঝোপটার ওপরের দিকে ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। মণ্টগোমেরি আর মোরো নেমে যাচ্ছেন নিচের সৈকতের দিকে। চিতা-মানুষ তখনও নিস্পন্দ নিশ্চুপ।

'যন্ত্রণা-ঘরে ফিরে যাবে…যন্ত্রণা-ঘরে…যন্ত্রণা-ঘরে—' ডানদিকে গজ কুড়ি দূর থেকে বানর-মানুষ আর্তনাদ করে উঠলো।

চিতা-মানুষ আমার মনে যতো আতঙ্ক এনে দিয়েছিলো, বানর-মানুষের কথাটা শোনা মাত্র আমি তার সমস্ত কিছু থেকে বেচারাকে ক্ষমা করে দিলাম।

ডান দিকে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে চলা ঘোড়া-গণ্ডারের ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপরেই হঠাৎ অন্ধকারে ঘন-সবুজ ঝোপের আড়ালে আমি চিতা-মানুষকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। যথা সম্ভব ছোট্ট জায়গার মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসে স্বচ্ছ সবুজ দুটো চোখ মেলে সে তখন লক্ষ্য করছে আমাকে।

হয়তো মনে হবে, এটা পরস্পরবিরোধী মনোভাব—ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারবো না—কিন্তু চিতা-মানুষের ওই ভাবে অবিকল জন্তুর মতো বসে থাকার ভঙ্গিমা, ওর চোখে আলোর দীপ্তি এবং আতঙ্কে বিকৃত হয়ে ওঠা ওর অদ্ভুত মুখ দেখেও আমার ফের মনে হলো, ও মানুষ। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অন্যান্য অনুসরণকারীরা ওকে দেখে ফেলবে, ওকে ধরে ফেলবে, তারপর ফের ওকে যন্ত্রণা-ঘরের সেই নিদারুণ অত্যাচার ভোগ করতে হবে।…আচমকা রিভলভারটাকে বের করে, আমি ওর আতঙ্ক-পীড়িত চোখ দুটোর মাঝখানে লক্ষ্য স্থির করে গুলি চালিয়ে দিলাম।

আমি গুলি চালাতেই হায়না-শুয়োর চিতা-মানুষটাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, নিজের তৃষিত দাঁতগুলো দিয়ে কামড়ে ধরলো চিতা-মানুষটার টুঁটি। আমার চারদিকে সবুজ ঝোপঝাড়গুলো তখন দুলে দুলে উঠছে, মটমট করে ভাঙছে শুকনো ডালপালা—পশু-মানুষরা সবাই ছুটে আসছে একসঙ্গে। এক এক করে এগিয়ে আসছে ওদের মুখগুলো।

'ওকে মারবেন না প্রেনডিক,' মোরো চিৎকার করে বললেন, 'ওকে মারবেন না!'

দেখতে পেলাম ফার্ণগুলোর ভেতর দিয়ে মোরো নিচু হয়ে বেরিয়ে আসছেন। পরমুহূর্তেই উনি হায়না-মানুষকে চাবুকের হাতল দিয়ে পিটিয়ে দূরে তাড়িয়ে দিলেন। উনি এবং মন্টগোমেরি দুজনে মিলে চিতা-মানুষের কেঁপে-কেঁপে ওঠা দেহটার কাছ থেকে উত্তেজিত মাংসাশী পশু-মানুষগুলোকে—বিশেষ করে মলিঙকে—দূরে সরিয়ে রাখলেন। ধূসর রঙের রোমশ প্রাণীটা লাশটার গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমার হাতের কাছে এসে দাঁড়ালো। অন্য প্রাণীগুলো ততোক্ষণে দৃশ্যটা আরও কাছ থেকে দেখবে বলে জান্তব আগ্রহে আমাকে ঠেলাঠেলি করতে শুরু করে দিয়েছে।

'এ আপনি কি করলেন, প্রেনডিক!' মোরো বললেন, 'ওকে আমার দরকার ছিলো!'

'আমি দুঃখিত,' বললাম —যদিও আসলে আমি তা নই। 'মুহূর্তের ঝোঁকে কাজটা হয়ে গেছে।'

ক্লান্তি আর উত্তেজনায় আমি অবসন্ন বোধ করছিলাম। পেছন ফিরে, দু হাতে পশু-মানুষদের ভিড় সরিয়ে আমি একাই চড়াইটা ধরে ওপরের দিকে উঠে গেলাম। ওদিকে মোরো চিৎকার করে হুকুম দিতেই সাদা পোশাক পরা তিনটে ষাঁড়-মানুষ লাশটাকে টানতে টানতে জলের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করলো।

এখন আমার পক্ষে একা হওয়া সহজ। মৃতদেহের সম্পর্কে পশু-মানুষদের কৌতূহল একেবারে মানুষেরই মতো। দল বেঁধে ওরা শবযাত্রার অনুসরণ করছে, গন্ধ শুঁকছে আর গর্জন করছে চিতা-মানুষের প্রতি। সন্ধ্যার গাঢ় আকাশের পটভূমিকায় ছায়াছায়া ষাঁড়-মানুষগুলো চিতা-মানুষটার ভারি লাশটাকে সমুদ্রের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে একটা ঢেউয়ের মতো হঠাৎ আমার মনে হলো, এ দ্বীপের সমস্ত কিছুই এতো অর্থহীন যে সে সম্পর্কে আর কিছু বলা চলে না।

নিচের সৈকতে বানর-মানুষ, হায়না-শুয়োর এবং আরও কয়েকটা পশু-মানুষ মন্টগোমেরি আর মোরোর আশেপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা তখনও দারুণ উত্তেজিত, প্রত্যেকেই প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে আইনের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা-আনুগত্য প্রকাশ করছে। তা সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানকার খরগোশ-হত্যার সঙ্গে হায়না-শুয়োরের অবশ্যই কোন যোগাযোগ আছে। আমার কেমন যেন মনে হলো, দৈহিক বিকৃতির কথা বাদ দিলে মানুষ-জীবনের সমস্ত কিছুই ওই ছায়াছায়া

অদ্ভুত-প্রাণীগুলোর মধ্যে সহজভাবে অল্প মাত্রায় রয়ে গেছে—প্রবৃত্তির সেই একই প্রকাশ, একই যুক্তি আর একই নিয়তি। তবে মরতে হলো চিতা-মানুষকে, প্রভেদ শুধু এটাই।

বেচারা পশুর দল! মোরোর নিষ্ঠুরতার কুৎসিত দিকটা এবার আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মোরোর কাছ থেকে ছাড়া পাবার পরেও যে ওদের কতো যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, কতো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তা আমি আগে ভেবে দেখিনি। তখন শুধু যন্ত্রণা-ঘরের নির্মম অত্যাচারের কথা ভেবেই আমি শিউরে উঠেছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম তুলনামূলক বিচারে সে যন্ত্রণা নেহাতই কম। আগে ওরা ছিলো পশু—পরিবেশের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে মানিয়ে নিয়ে ওরা তখন আর পাঁচটা প্রাণীর মতোই সুখে জীবন কাটাতো। কিন্তু মানবধর্মের শৃঙ্খলে এখন ওরা সহজভাবে চলতে-ফিরতে পারছে না, আইনের নিষেধে অশেষ আতঙ্ক নিয়ে ওদের দিন কাটে—যে আইনের অর্থও ওদের কাছে বোধগম্য নয়। যন্ত্রণা দিয়ে শুরু হয় ওদের এই হাস্যকর মানবজীবন, তারপর দীর্ঘস্থায়ী এক চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব, সারাটা জীবন মোরোর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকা। কিন্তু কেন? কি প্রয়োজন ছিলো এর? মোরোর এই অর্থহীন খামখেয়ালিপনা আমার মনটাকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে তুললো।

যদি কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মোরো এ কাজে নামতেন তাহলে আমি হয়তো ওঁর প্রতি খানিকটা সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠতাম। এমনিতে যন্ত্রণার ব্যাপারে আমি তেমন খুঁতখুঁতে নই। ঘৃণার বশেও উনি যদি এ কাজ করতেন, তাহলেও আমি হয়তো ওঁকে কিছুটা ক্ষমা করতে পারতাম। কিন্তু এ যে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, প্রচণ্ড ঔদাসীন্য! ওঁর অনুসন্ধিৎসা, ওঁর উদ্দেশ্যহীন উন্মাদ গবেষণা ওঁকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে আর তার ফলস্বরূপ ওই হতভাগা জীবগুলোকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে এক দুর্দশাময় জীবনের মধ্যে—হয়তো ওরা বছর খানেক বাঁচবে, প্রতিপদে বাধার সঙ্গে ওদের লড়তে হবে, ওরা ভুল করবে, অসুবিধেয় পড়বে, তারপর শেষ অব্দি কষ্ট পেয়ে মরবে। আগেকার পশুসুলভ প্রবৃত্তিতে ওরা এখনও একে অন্যকে ঘৃণা করে, আইনের বাঁধন না থাকলে ইতিমধ্যেই ওরা প্রকৃতিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সর্বনেশে হানাহানিতে নেমে পড়তো।

ক্রমে পশু-মানুষদের সম্পর্কে আমার আতঙ্ক মোরোর সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত আতঙ্কের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলো। ঠিক ভয় নয়, কিন্তু আমি কেমন যেন নির্জীব, মনমরা হয়ে উঠলাম। এই অবস্থাটা আমার মনে এক চিরস্থায়ী ছাপ

রেখে গেছে। স্বীকার করছি, দ্বীপবাসীদের দুর্দশা দেখে আমি পৃথিবীতে সুস্থবুদ্ধির অস্তিত্ব সম্পর্কেই নিজের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম সেদিন।

অন্ধ নিয়তি—নির্মম এক বিশাল যন্ত্রদানব যেন ইচ্ছেমতো ভেঙেচুরে আমাদের অস্তিত্বের আদলটাকেই বদলে দিচ্ছিলো সেদিন। আমি, গবেষণা-পাগল মোরো, সুরায় আসক্ত মণ্টগোমেরি এবং প্রবৃত্তি আর নিষেধের দোটানায় বন্দী পশু-মানুষরা—সবাই সেই যন্ত্রদানবের অবিশ্রান্ত ঘুরে-চলা জটিল চাকায় নির্মম ও অনিবার্যভাবে পিষ্ট আর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হচ্ছিলাম প্রতিদিন। কিন্তু এই পরিস্থিতিটা হঠাৎ করে এসে হাজির হয়নি···সম্পূর্ণ কাহিনীটা বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে, এমনটি হবে বলে আমি আগেই আশা করেছিলাম।

চরম বিপদ

ছটা সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই মোরোর এই সমস্ত জঘন্য গবেষণা সম্পর্কে আমি ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা ছাড়া মনের অন্য সমস্ত অনুভূতিগুলোকে হারিয়ে ফেল্লাম। আমার একমাত্র চিন্তা হলো, ঈশ্বরের সৃষ্টির হাস্যকর অনুকরণে গড়া ওই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোর কাছ থেকে পালিয়ে মানুষের মধুর সংসর্গে ফিরে যাওয়া। আমার স্বজাতি মানুষ—যাদের কাছ থেকে আমি এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি—মনে হতে লাগলো তারা কতো ভালো, কতো সুন্দর। মণ্টগোমেরির সঙ্গে আমার প্রথম দিককার বন্ধুত্ব এতোদিনে আর একটুও বাড়েনি। মানুষের সমাজ থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, মদের প্রতি অত্যধিক আসক্তি এবং পশু-মানুষদের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট সহানুভূতি আমাকে তাঁর সম্পর্কে বিরক্ত করে তুলেছে। প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে আমি পশু-মানুষদের সংসর্গ এড়াতে চেয়েছি বলে বহুবার মণ্টগোমেরিকে একা একাই ওদের কাছে যেতে হয়েছে—আমি যাইনি।

আমার বেশির ভাগ সময়টা আমি সমুদ্রের ধারেই কাটাতাম—যদি কোনো মুক্তিদাতা জাহাজের পাল চোখে পড়ে, এই আশায়। কিন্তু জাহাজ আর আসে না। তারপর একদিন এমন একটা আকস্মিক বিপর্যয় ঘটে গেলো যা আমার নতুন পরিবেশের ধারাটাকেই পুরোপুরি বদলে দিলো।

দুর্ঘটনাটা ঘটলো আমি এ দ্বীপে এসে পৌঁছবার সাত-আট সপ্তাহ কিংবা আরও কিছুদিন বাদে—সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ ইতিমধ্যে আমি

সময়ের হদিশ রাখার কোনো চেষ্টাই করিনি। খুব ভোরে—বোধহয় ছটা নাগাদ তিনটে পশু-মানুষ আমাদের ঘেরাও চত্বরটাতে কাঠ নিয়ে এসেছিলো। ওদের গোলমালে ঘুম ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি সকালের জলখাবার খেয়ে নিয়ে আমি খোলা সদর-দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে ভোরের সতেজ বাতাসটুকু উপভোগ করছিলাম। এমন সময় মোরো এসে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেলেন। শব্দ শুনে বুঝলাম, উনি তালা খুলে গবেষণাগারে গিয়ে ঢুকলেন। এই জঘন্য দ্বীপটার সম্পর্কে আমি তখন এতোই বিগতস্পৃহ যে পুমাটা নতুন করে চিৎকার শুরু করা সত্ত্বেও আমার মনে এতোটুকু আবেগের স্পর্শ লাগলো না।

তারপরেই কিছু একটা হয়ে গেলো। কি যে হয়েছিলো, তা আমি আজ অব্দি সঠিকভাবে জানি না। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে পেছনে ফিরতেই দেখি একটা বীভৎস মুখ তীব্রগতিতে আমার দিকে ছুটে আসছে। মুখটা মানুষের নয়, কোনো পশুরও নয়—কদাকার একটা বাদামি রঙের মুখ, তাতে কাটাকুটির লালচে দাগে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে, পাতাবিহীন চোখ দুটোতে জ্বলন্ত দৃষ্টি। সংঘর্ষ থেকে নিজেকে বাঁচাতে আমি হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সর্বাঙ্গে রক্তে-ভিজে-ওঠা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে দানবটা আমাকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিলো, তারপর এক লাফে আমাকে টপকে ছুটতে ছুটতে চলে গেলো সামনের দিকে। ভাঙা হাত নিয়ে আমি উঠে বসতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। এমন সময় মোরো ভেতর থেকে সেখানে এসে হাজির হলেন। কপাল থেকে গড়িয়ে নামা রক্তের ধারায় তাঁর বিশাল ফর্সা মুখখানা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এক হাতে রিভলভার। আমাকে উনি প্রায় দেখলেনই না, পুমাটাকে অনুসরণ করার জন্যে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন।

অন্য হাতে ভর রেখে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, সমুদ্রের তীর ধরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা জীবটা লম্বা লম্বা পদক্ষেপে ছুটে চলেছে, তার পেছনে মোরো। পুমাটা মুখ ঘুরিয়ে মোরোকে একবার দেখে নিয়েই আচমকা গতিবেগ দ্বিগুণ করে ঝোপগুলোর দিকে ছুটে চললো। প্রতিটা পদক্ষেপেই সে মোরোর কাছ থেকে নিজের দূরত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছিলো। দেখলাম সে ঝোপটার দিকে ঝাঁপ দিলো। ওকে আটকাবার জন্যে মোরো আড়াআড়িভাবে ছুটে যাচ্ছিলেন, এবারে উনি পুমাটার দিকে গুলি ছুঁড়লেন। গুলি ব্যর্থ হলো, পুমাটাও ঝোপের আড়ালে

উধাও হয়ে গেলো। পরক্ষণেই মোরোও হারিয়ে গেলেন ঘন সবুজ ঝোপের আড়ালে।

আমি ওদের পেছন পেছন এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাতের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলাম। ইতিমধ্যে মণ্টগোমেরিও ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, ওঁরও হাতে রিভলভার। আমি যে আহত হয়েছি তা লক্ষ্য না করেই উনি বললেন, 'কি হয়েছে জানেন, প্রেনডিক? হতচ্ছাড়া জন্তুটা বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে! আপনি ওঁদের দেখেছেন?' তারপরেই আমাকে ভাঙা হাতট ধরে থাকতে দেখে বললেন, 'কি হয়েছে আপনার?'

বললাম, 'আমি তখন ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'আস্তিনে রক্ত লেগে রয়েছে দেখছি,' আস্তিনটা গুটিয়ে দিয়ে উনি আমার হাতটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আপনার হাতটা ভেঙে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি করে হলো, বলুন তো—কি হয়েছিলো?'

আমি যা দেখেছি যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ওঁকে তা বললাম। ততোক্ষণে উনি নিপুণ ভাবে দ্রুত আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন। হাতটা কাঁধের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে উনি আমার দিকে তাকালেন, 'এতেই কাজ হবে।' তারপর কি যেন ভেবে, বেরিয়ে গিয়ে চত্বরের ফটকে তালা লাগিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ তাঁকে আর দেখতে পেলাম না।

হাতটা নিয়েই আমার চিন্তা হচ্ছিলো বেশি। ঘটনাটাকে এখানকার আর পাঁচটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সমগোত্রীয় বলেই মনে হচ্ছিলো। ডেক চেয়ারে বসে, সত্যি বলতে কি, আমি প্রাণ খুলে দ্বীপটাকে গালাগাল দিতে লাগলাম।

মণ্টগোমেরি যখন ফিরলেন তখন আমার ভাঙা হাতের প্রথম দিককার অস্পষ্ট যন্ত্রণাটা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ওঁর মুখটা যেন খানিকটা বিবর্ণ বলে মনে হলো আমার।

'মোরোকে দেখতেও পেলাম না বা তাঁর গলাও শুনতে পেলাম না। ভেবেছিলাম, হয়তো আমার সাহায্যের দরকার হবে।' অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে উনি আমার দিকে তাকালেন, 'জন্তুটার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। দেয়াল থেকে ও শেকলটাকে স্রেফ উপড়ে নিয়ে গেছে।' জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে মণ্টগোমেরি আবার দরজার দিকে ফিরে গেলেন। তারপর ঘুরে তাকালেন আমার দিকে, 'আমি ওঁকে খুঁজতে যাবো। আমাদের আরও একটা রিভলভার আছে, সেটা আমি

আপনার কাছে রেখে যেতে পারি। সত্যি বলতে কি, যে কোনো কারণেই হোক আমি খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি।'

অস্ত্রটা টেবিলের ওপরে, আমার হাতের কাছে তৈরি রেখে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—আর রেখে গেলেন ওঁর উদ্বেগের ছোঁয়াচ। উনি চলে যাবার পর আমিও আর বেশিক্ষণ বসে রইলাম না, রিভলভার হাতে নিয়ে আমিও সদর-দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভোরের প্রকৃতি তখন মৃত্যুর মতো নিথর নিস্পন্দ। বাতাস বয়ে চলার এতোটুকু ফিসফিসানি অব্দি নেই। সমুদ্রটা কাচের মতো নিস্তরঙ্গ। আকাশভরা শুধু শূন্যতা। সমুদ্রতীর নির্জন নিঝুম। কিছুটা উত্তেজনা আর কিছুটা শারীরিক অশান্তিতে এই নির্জন-স্তব্ধতা আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে তুললো।

আমি শিস দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্বর ফুটলো না। ফের আমি গালাগাল দিয়ে উঠলাম—আজ সকালে এই দ্বিতীয় বার। তারপর চত্বরের কোণের দিকটাতে গিয়ে সেই সবুজ ঝোপটার দিকে তাকালাম, যার আড়ালে উধাও হয়ে গেছেন মোরো আর মণ্টগোমেরি। কখন ফিরবেন ওঁরা? কিভাবেই বা ফিরবেন?

দেখতে পেলাম, অনেক দূরে ছোট্ট একটা ধূসর রঙের পশু-মানুষ সমুদ্রের ধারে ছুটতে ছুটতে গিয়ে জল ছিটোতে শুরু করেছে। আমিও আবার চত্বরের কোণের দিকটাতে ফিরে গিয়ে পাহারাদারদের মতো অনবরত পায়চারি করতে শুরু করলাম। একবার দূর থেকে যেন মণ্টগোমেরির চিৎকার শুনতে পেলাম, 'মো—রো—!'

হাতের ব্যথা অনেকটা কম, কিন্তু ভীষণ গরম। আমার জ্বরজ্বর লাগছিলো, তেষ্টাও পেয়েছে। ক্রমে আমার ছায়াটা ছোটো হয়ে এলো। দূরের প্রাণীটা উধাও হয়ে না যাওয়া অব্দি আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মোরো আর মণ্টগোমেরি কি কোনোদিনই ফিরে আসবেন না?

তিনটে সমুদ্র-পাখি সমুদ্রের কূলে এসে ঠেকে-থাকা যেন কি একটা অমূল্য সম্পদ নিয়ে লড়াই শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎ চত্বরের পেছন দিকে অনেক দূর থেকে আমি একটা পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফের একটা। তারপর একটু কাছ থেকে একটা আর্তচিৎকার ভেসে এলো, তারপর ফের কিছুক্ষণের নীরবতা। যতো রাজ্যের অমঙ্গুলে কল্পনা আমাকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করলো।

তারপরেই হঠাৎ খুব কাছে থেকে একটা পিস্তলের শব্দ শোনা গেলো। কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে মণ্টগোমেরিকে দেখতে পেয়ে আমি চমকে উঠলাম—ওঁর মুখটা টকটকে লাল, চুলগুলো এলোমেলো, পাতলুনের হাঁটুর কাছ দুটো ছেঁড়া আর সমস্ত মুখে সুস্পষ্ট আতঙ্কের প্রকাশ। ওঁর পেছন পেছন কুঁজো হয়ে হাঁটছে মলিং, তার চোয়াল ঘিরে কেমন যেন একটা বিশ্রী লালচে রঙের দাগ।

'মোরো কি ফিরেছেন?' মণ্টগোমেরি জিজ্ঞেস করলেন।

'মোরো? না!'

'হায় ভগবান!' মণ্টগোমেরি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে আমার একটা হাত ধরলেন, 'ভেতরে চলুন। ওরা উন্মাদ হয়ে গেছে! পাগলের মতো চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কি এমন হতে পারে?...জানি না।...দাঁড়ান, একটু দম নিয়ে সব বলছি। আচ্ছা, একটু ব্র্যাণ্ডি কোথায় পাওয়া যায়, বলুন তো?'

মণ্টগোমেরি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকে ডেক চেয়ারটাতে বসে পড়লেন। মলিং দরজার বাইরে বসে কুকুরের মত হাঁফাতে লাগলো। আমি মণ্টগোমেরিকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি আর জল এনে দিলাম। উনি সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দম ফেরাতে লাগলেন, তারপর কিছুক্ষণ বাদে পুরো ঘটনাটা বলতে শুরু করলেন আমাকে।

চিহ্ন দেখে পথ চিনে চিনে মণ্টগোমেরি কিছুদূর অব্দি ওদের পথেই গিয়েছিলেন। ভাঙাচোরা ঝোপঝাড়, পুমার গায়ের ব্যাণ্ডেজ থেকে খসে পড়া সাদা কাপড়ের টুকরো আর মাঝে মধ্যে গাছপালার পাতায় লেগে থাকা রক্তের দাগ দেখে প্রথম দিকে পথ চিনতে ওঁর কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু নদীর ওধারে পাথুরে জায়গাটায় পৌঁছে—যেখানে আমি সেই পশু-মানুষটাকে জল শুষে খেতে দেখেছিলাম—মণ্টগোমেরি ওদের দিশে হারিয়ে ফেলেন। তখন উনি উঁচু গলায় মোরোর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উদ্দেশ্যহীনের মতো পশ্চিম দিকে যেতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে মলিঙও গিয়ে মণ্টগোমেরির সঙ্গে যোগ দেয়। মলিং পুমার ব্যাপারটা কিছুই দেখেনি। সে কাঠ কাটতে গিয়েছিলো, মণ্টগোমেরির হাঁকডাক শুনে তাঁর কাছে ছুটে যায় এবং দুজনে মিলে তারস্বরে মোরোকে ডাকতে থাকে। এমন সময় দুটো পশু-মানুষ ঝোপের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে ওদের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের অদ্ভুত ভাবভঙ্গি মণ্টগোমেরিকে প্রচণ্ড চিন্তায় ফেলে দেয়। তিনি ওদের ডাকতেই ওরা অপরাধীর মতো পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পরে মণ্টগোমেরি ডাকা-ডাকি বন্ধ করে আরও খানিকক্ষণ এধার-ওধারে ইতস্তত ঘুরে বেড়ান এবং তারপর

স্থির করেন পশু-মানুষদের কুটিরে গিয়ে মোরোর খোঁজ করবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে উনি দেখেন,কেউ কোথাও নেই।

এবারে প্রতি মুহূর্তেই মণ্টগোমেরির আশঙ্কা বেড়ে উঠতে থাকে—যে পথে গিয়েছিলেন সে পথ ধরেই উনি ফিরতে শুরু করেন। পথে দুটো শুয়োর-মানুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়—এ দ্বীপে এসে পৌঁছনোর দিন রাত্রিবেলা আমি ওদেরই নাচতে দেখেছিলাম। মণ্টগোমেরি লক্ষ্য করেন, ওদের মুখে রক্তের দাগ এবং ওরা প্রচণ্ড উত্তেজিত। ওদের ভয় দেখাবার জন্যে তিনি চাবুকের শব্দ করেন, কিন্তু তাতে ওরা দুজনে মিলে তাঁর দিকেই তেড়ে আসে—এর আগে কোনো পশু-মানুষই এমন কাজ করতে সাহস পায়নি। তখন মণ্টগোমেরি ওদের একজনের মাথায় গুলি করেন এবং মলিং অন্যজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলায় দাঁত বসিয়ে দেয়। ফলে মণ্টগোমেরি অন্য পশু-মানুষটাকেও গুলি করেন এবং বহু কষ্টে মলিঙকে সেখান থেকে চলে আসতে রাজি করান।

এরপরে ওরা দ্রুত বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। পথে মলিং ছোটোখাটো একটা বনবেড়াল-মানুষকে তাড়া করে ঝোপ থেকে বের করে আনে। এরও গায়ে রক্তের দাগ, পায়ে চোট ছিলো বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছিলো। কিছুদূর অব্দি এগিয়ে গিয়ে ওই ছোট্ট জীবটাও মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং মণ্টগোমেরি তখন—আমার ধারণা খানিকটা খেয়ালের বশেই—তাকেও গুলি করেন।

'কি অর্থ এ সবের ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মণ্টগোমেরি মাথা নেড়ে ফের ব্র্যাণ্ডির দিকে হাত বাড়ালেন।

মোরোর সন্ধান

মণ্টগোমেরিকে তৃতীয় বার ব্র্যাণ্ডি গিলতে দেখে আমি আর ওঁকে বাধা না দিয়ে পারলাম না। ততোক্ষণে উনি প্রায় মাতাল হয়ে উঠেছেন। বললাম, ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই মোরোর কোনো সাংঘাতিক বিপদ হয়েছে, নয়তো এতোক্ষণে তিনি ফিরে আসতেন—অতএব বিপদটা কি তা আমাদের বোঝা দরকার। সামান্য প্রতিবাদ জানিয়ে অবশেষে মণ্টগোমেরি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। অল্প কিছু খাওয়া-দাওয়া করে আমরা তিনজনে মিলে বেরিয়ে পড়লাম।

হয়তো আমার মনটা তখন উদ্বেগ আর উত্তেজনায় একেবারে টানটান হয়ে

ছিলো বলেই, ক্রান্তীয় অপরাহ্ণের নিস্তব্ধ উষ্ণতায় আমাদের সেই অভিযানের প্রতিটি খুঁটিনাটির কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। পিঠ কুঁজো করে মলিং যাচ্ছিলো সবার আগে আগে। চকিত ভঙ্গিমায় কালো মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে তাকাচ্ছিলো বারবার। তার হাতে কোনো অস্ত্র ছিলো না—শুয়োর-মানুষের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তার কুড়ুলটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিলো কোথাও। লড়াইয়ের সময় দাঁতই হয়ে উঠেছিলো তার অস্ত্র। টলোমলো পায়ে মণ্টগোমেরি অনুসরণ করছিলেন মলিংকে—তাঁর হাত দুটো পকেটে গোঁজা, দৃষ্টি আনত। ব্র্যাণ্ডির ব্যাপারে উনি আমার ওপরে বেশ বিরক্ত। আমার বাঁ হাতটা গলার সঙ্গে ঝোলানো—ভাগ্যিস ওটা বাঁ হাত—আর ডান হাতে রিভলভার।

দ্বীপের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে এগুতে লাগলাম। একটু বাদেই মলিং হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একেবারে স্থাণু হয়ে উঠলো। মণ্টগোমেরিও টলতে টলতে প্রায় ওর গায়ে পড়তে পড়তেও নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। উৎকর্ণ হয়ে আমরা শুনতে পেলাম, গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েকটা কণ্ঠস্বর আর পায়ের শব্দ ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'তিনি মরে গেছেন!' কাঁপা-কাঁপা গম্ভীর গলায় কে যেন বললে।

'মরেননি, তিনি মরেননি,' আধোভাষে আর একজন বললো।

'আমরা দেখেছি, আমরা দেখেছি,' একসঙ্গে বলে উঠলো অনেকে।

হঠাৎ মণ্টগোমেরি চিৎকার করে উঠলেন, 'ওহে, শোনো এদিকে!'

'এটা কি করলেন আপনি!' আমি শক্ত করে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরলাম।

কিছুক্ষণ চারদিকে সবকিছুই চুপচাপ। তারপর ঝোপঝাড়-জঙ্গল মাড়িয়ে প্রথমে এখানে একটা, তারপর ওখানে একটা—এমনি করে মোট গোটা ছয়েক মুখ আমাদের সামনে এসে হাজির হলো। মুখগুলোতে এক আশ্চর্য উত্তেজনার দীপ্তি। মলিং গলা দিয়ে এক অদ্ভুত গর্জন বের করলো। ওদের মধ্যে আমি বানর-মানুষকে চিনতে পারলাম—গলা শুনেই বুঝেছিলাম সে ওখানে রয়েছে। আর চিনলাম সাদা পোশাক পরা বাদামি রঙের দুটো প্রাণীকে, যাদের আমি আগেই মণ্টগোমেরির নৌকোয় দেখেছিলাম। ওদের সঙ্গে গায়ে ছোপ-ছোপ দাগওলা দুটো প্রাণীও ছিলো। আর ছিলো ধূসর রঙের সেই ভয়ঙ্কর জীবটা—যে আইন পড়ায়, যার মধ্যিখানে সিঁথি-কাটা ধূসর রঙের চুলগুলো গালের

দু পাশে ঝুলে পড়েছে, যার চোখের ওপরে ধূসর রঙের মোটা ভুরু—গাছপালার ভেতর থেকে অদ্ভুত লাল চোখ মেলে সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলো আমাকে।

খানিকক্ষণ কেউই কিছু বললো না। তারপর মণ্টগোমেরি একটা হিক্কা তুললেন, 'কে···কে বলেছে, উনি মরে গেছেন?'

বানর-মানুষ অপরাধীর ভঙ্গিতে ধূসর রঙের সেই রোমশ প্রাণীটার দিকে তাকালো।

'তিনি মরে গেছেন,' দানবটা বললো, 'ওরা দেখেছে।'

প্রাণীটার নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অন্তত আতঙ্কিত হবার মতো কিছু নেই। মনে হলো ওরা নিজেরাই যেন আতঙ্ক-পীড়িত আর বিহ্বল।

'তিনি কোথায়?' মণ্টগোমেরি জানতে চাইলেন।

'ওদিকে,' ধূসর প্রাণীটা আঙুল তুলে দেখালো।

'এখন কি আইন আছে?' বানর-মানুষ জিজ্ঞেস করলো, 'এখনও কি সেই এটা নয়, ওটা নয় চলবে? তিনি কি সত্যিই মারা গেছেন?'

'আইন কি আছে?' সাদা পোশাক পরা মানুষটা প্রশ্ন করলো।

'দু নম্বর চাবুকধারী, এখনও কি আইন আছে?' ধূসর প্রাণীটা জিজ্ঞেস করলো। 'তিনি তো মরে গেছেন!'

ওরা সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো আমাদের।

'প্রেনডিক,' মণ্টগোমেরি নিস্তেজ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে ফিরে তাকালেন, 'তাহলে উনি সত্যিই মারা গেছেন।'

এই সমস্ত কথোপকথনের সময় আমি মণ্টগোমেরির পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। এবারে আমি পরিস্থিতিটা সঠিক বুঝতে পারলাম। তাই আচমকা সামনে এগিয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে বললাম, 'আইনের সন্তানগণ, তিনি মারা যাননি!'

মলিং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকালো।

আমি বলতে লাগলাম, 'তিনি আকৃতি বদলেছেন···নিজের দেহটাকে বদলে নিয়েছেন। কিছুদিন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে না। তিনি এখন—ওখানে,' আমি আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখালাম। 'ওখান থেকে তিনি তোমাদের দিকে লক্ষ্য রাখছেন। তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু তিনি তোমাদের দেখছেন। কাজেই আইনকে ভয় করে চলো।'

আমি সরাসরি ওদের দিকে তাকালাম, ওরা কুঁকড়ে উঠলো।

'তিনি মহান, তিনি ভালো,' ঘন গাছগাছালির ভেতর দিয়ে বানর-মানুষ ভয়ে ভয়ে আকাশের দিকে তাকালো।

'তিনি যার পেছনে ছুটে গিয়েছিলেন, তার কি হলো?' আমি জানতে চাইলাম।

'সে চিৎকার করতে করতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে ছুটছিলো। তার গা দিয়ে রক্ত ঝরছিলো।' ধূসর-রঙের জীবটা আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'সেও মরে গেছে।'

'বাঁচা গেছে,' মণ্টগোমেরি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বললেন।

'কিন্তু দ্বিতীয় চাবুকধারী বলছিলেন…' ধূসর-প্রাণীটা ফের মুখ খুললো।

'কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বলছিলেন যে তিনি মারা গেছেন।'

মোরোর মৃত্যুকে অস্বীকার করার পেছনে আমার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা বোঝার মতো ক্ষমতা তখনও মণ্টগোমেরির ছিলো। তাই উনি আস্তে আস্তে বললেন, 'তিনি মারা যাননি, মোটেই মারা যাননি। তিনি আমার মতোই জীবিত।'

'কেউ কেউ আইন ভেঙেছে। তারা মরবে। কেউ কেউ তো ইতিমধ্যেই মরেছে।' আমি বললাম, 'তাঁর পুরনো দেহটা কোথায় পড়ে রয়েছে আমাদের দেখিয়ে দেবে—চলো। ওই দেহটা তিনি ছেড়ে গেছেন, কারণ দেহটাকে তাঁর আর কোনো প্রয়োজন ছিলো না।'

'এই পথ দিয়ে আসুন, সমুদ্রে-নেমে-যাওয়া মানুষ।' ধূসর জীবটা বললো।

সেই ছটা বিচিত্র প্রাণীর পেছন পেছন আমরা ঝোপঝাড়, বন-জঙ্গল, লতা-পাতার ভেতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগুতে লাগলাম। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার আর ডালপালা ভাঙার শব্দ শোনা গেলো। পরক্ষণেই ছোট্ট একটা গোলাপি রঙের প্রাণী চিৎকার করতে করতে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেলো। একটু পরেই তাকে তাড়া করে এলো রক্ত-মাখা একটা ভয়ঙ্কর দানব। বেগ সামলাবার আগেই দানবটা প্রায় আমাদের মধ্যে এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ধূসর-প্রাণীটা একলাফে পাশের দিকে সরে গেলো। হিংস্র গর্জন তুলে মলিং ঝাঁপিয়ে পড়লো দানবটার ওপরে, কিন্তু দানবটা তাকে ছিটকে ফেলে দিলো। মণ্টগোমেরি গুলি করলেন, কিন্তু গুলি লাগলো না দেখে তিনি মাথা নিচু করে দু হাত তুলে পেছন দিকে ছুটতে শুরু করলেন। এবারে আমি গুলি করলাম, তবু

মানুষ। কোথায় যাবো, কি করবো ? আপনার পক্ষে অবিশ্যি তাতে ভালোই হবে। বেচারা মোরো! ওঁর দেহটাকে তো আমরা এভাবে ফেলে যেতে পারি না! আর তা ছাড়া…পশু-মানুষদের মধ্যে যারা ভালো, তাদেরই বা কি হবে?'

'সে সব কাল ভাবা যাবে।' বললাম, 'আমি ভাবছিলাম, আমরা ওই ভাঙা ডালপালাগুলো দিয়ে একটা চিতা সাজিয়ে মোরোর দেহটাকে দাহ করলে পারি …আর ওই প্রাণীগুলোকেও।…কিন্তু ভবিষ্যতে পশু-মানুষদের কি হবে, বলুন তো?'

'জানি না। তবে আমার ধারণা শিকারী-পশু থেকে যাদের তৈরি করা হয়েছিলো, আজ হোক বা দুদিন বাদে হোক—তাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠবে। কিন্তু তাই বলে তো আমরা ওদের পুরো দলটাকে সাবাড় করে দিতে পারি না! পারি কি?…অবিশ্যি আপনার মনুষ্যত্ববোধ হয়তো তা-ই করতে বলবে, তাই না?…তবে ওরা বদলে যাবে—অবশ্যই বদলে যাবে।'

এমনিভাবে উনি একটানা এলোমেলো বকতে লাগলেন। ফলে শেষ অব্দি আমারও মেজাজ চড়তে শুরু করলো।

'চুলোয় যাক সবকিছু!' একসময় আমার বিরক্তি লক্ষ্য করে মণ্টগোমেরি খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনার চাইতে আমার অবস্থা যে কতোটা খারাপ, তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?' তারপর উনি ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নিয়ে এসে বললেন, 'আসুন তার্কিক-প্রবর, ফ্যাকাসে-মুখো সন্তপুরুষ—একটু মদ্য পান করা যাক।'

গম্ভীর মুখে বললাম, 'আমি খাবো না।' তারপর মোমবাতির হলদে আলোয় লক্ষ্য করতে লাগলাম মণ্টগোমেরির চরম দুর্দশা। অনেক আবোল তাবোল বকতে বকতে একসময় উনি পশু-মানুষ এবং মলিঙের হয়েও খানিকটা ওকালতি করলেন। বললেন, একমাত্র মলিংই নাকি ওঁর কথা একটু চিন্তা করে। হঠাৎ কি একটা কথা মনে হতেই উনি বলে উঠলেন, 'গোল্লায় যাক সবকিছু।' তারপর মদের বোতলটা আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন টলতে টলতে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ওঁর উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেললাম। মুহূর্তের মধ্যে ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, 'ওই পশুটাকে আপনি মদ দেবেন না।'

'পশু!' মণ্টগোমেরি বললেন, 'পশু আপনি! একজন খ্রিষ্টানের মতোই ও মদ খাবে। আপনি আমার পথ ছাড়ুন, প্রেনডিক।'

'দোহাই আপনার!'

'সরুন···পথ ছাড়ুন,' গর্জে উঠে মণ্টগোমেরি আচমকা রিভলভারটা পকেট থেকে টেনে বের করলেন।

'বেশ,' 'আমি সরে দাঁড়ালাম। মণ্টগোমেরি দরজার হাতলে হাত নামাতেই মনে হলো, ওঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু ভাঙা হাতটার কথা ভেবে সে চিন্তা থেকে বিরত রইলাম। বললাম, 'নিজেকে তো আপনি পশুই করে তুলেছেন। যান, পশুদের কাছেই যান।'

দরজাটা খুলে মণ্টগোমেরি মোমবাতির হলদে-আলো আর চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড়াআড়ি ভাবে আমার দিকে তাকালেন। খোঁচা-খোঁচা ভ্রূজোড়ার নিচে অন্ধকার হয়ে উঠলো ওঁর চোখের কোটর দুটো।

'আপনি মহা খুঁতখুঁতে মানুষ, প্রেনডিক! একেবারে গণ্ডমূর্খ! সবকিছুতেই আপনার ভয় আর দুশ্চিন্তা। এখন আমরা বিপদের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছি। হয়তো কালই আমি নিজের গলা কাটবো। তাই আজকের রাত্তিরটা আমি মনের আনন্দে ছুটি কাটাবো।'

মণ্টগোমেরি মুখ ঘুরিয়ে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে গেলেন। তারপর চিৎকার করে ডাকলেন, 'মলিং···মলিং! কই রে, আমার পুরনো বন্ধু!'

চাঁদের রুপোলি আলোয় তিনটে প্রাণীর অস্পষ্ট ছায়া সমুদ্রের কাছ থেকে এগিয়ে এলো। প্রথম জনের পরনে সাদা পোশাক, তার পেছনে দুটো অন্ধকার ছায়ামূর্তি। থমকে দাঁড়িয়ে ওরা তাকিয়ে রইলো। তারপর দেখি বাড়ির কোণের দিক থেকে মলিংও এগিয়ে এলো কুঁজো-পিঠ নিয়ে।

'খা, খেয়ে নে পশুরা, মদ খেয়ে তোরা মানুষ হয়ে ওঠ,' মণ্টগোমেরি চিৎকার করে উঠলেন। 'নাঃ, আমিই দেখছি সব চাইতে চালাক! মোরোও এ ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে তুলির শেষ টান। নে, খেয়ে নে!' হাতের বোতলটা দোলাতে দোলাতে দ্রুত পায়ে, যেন লাফাতে লাফাতে, উনি পশ্চিম দিকে এগুতে লাগলেন। মলিংও ভিড়ে পড়লো মণ্টগোমেরি আর তাঁর পেছন পেছন যেতে থাকা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি তিনটের মাঝখানে।

আমি ফটকের কাছে এগিয়ে গেলাম। চাঁদের আবছা আলোয় ওরা ততোক্ষণে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখলাম, মণ্টগোমেরি থমকে দাঁড়িয়ে মলিংকে একমাত্রা নির্জলা ব্র্যাণ্ডি খাওয়ালেন। তারপরেই পাঁচটা শরীর একজায়গায় জড়ো হয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলো।

'গান ধর,' শুনতে পেলাম মণ্টগোমেরি চিৎকার করে বলছেন, 'সকলে মিলে

সে এগিয়ে আসতে লাগলো। একেবারে কাছ থেকে ফের গুলি করলাম তার কুৎসিত মুখটাতে। মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম, তার মুখটা যেন বসে গেলো—উধাও হয়ে গেলো নাক-চোখ-মুখ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আমাকে পেরিয়ে গিয়ে মণ্টগোমেরিকে আঁকড়ে ধরে ছিটকে পড়লো—তারপর ছটফট করতে লাগলো মৃত্যু যন্ত্রণায়।

তাকিয়ে দেখি সমস্ত তল্লাটে আমি, মলিং, মৃত দানবটা আর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মণ্টগোমেরি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। মণ্টগোমেরি আস্তে আস্তে উঠে ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাঁর পাশে পড়ে থাকা বিধ্বস্ত পশু-মানুষটার দিকে তাকালেন। মনে হলো এতোক্ষণে উনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। নেশার ঘোর কেটে গেছে পুরোপুরি। কষ্টেসৃষ্টে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালেন উনি। তারপরেই দেখলাম, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ধূসর-প্রাণীটা সন্তর্পণে ফিরে আসছে।

মৃত দানবটাকে দেখিয়ে আমি বললাম, 'দেখেছো তো, এখনও আইন আছে কি না? আইন ভাঙলে এই দশাই হয়।'

মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে ধূসর-প্রাণীটা গম্ভীর গলায় ওদের স্তোত্রের একটা অংশ উচ্চারণ করলো, 'মৃত্যু আনে যে আগুন—সে যে তাঁর!'

ততোক্ষণে অন্য পশু-মানুষরাও এসে সেখানে জড়ো হয়েছে।

অবশেষে আমরা দ্বীপের পশ্চিমতম সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে পুমাটার ক্ষত বিক্ষত বিকৃত লাশটা খুঁজে পেলাম। গুলির আঘাতে তার কাঁধের হাড় সম্পূর্ণ গুঁড়ো হয়ে গেছে। আরও বিশ গজ এগিয়ে গিয়ে আমরা যা খুঁজছিলাম, তার সন্ধান পেলাম। একটা বেত ঝোপের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়েছিলেন মোরো। একটা হাত কব্জির কাছ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, মাথার রুপোলি চুলে জমাট বাঁধা রক্ত। পুমার শেকলের আঘাতে ওঁর মাথাটা থেঁতলে গিয়েছিলো। ওঁর দেহের নিচের ভাঙা বেতগুলোও রক্তাক্ত। কিন্তু হাতের রিভলভারটা কোথাও নেই।

মণ্টগোমেরি ওঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন।

মোরো ভারি চেহারার মানুষ। বারকতক থেমে থেমে বিশ্রাম নিয়ে সাতজন পশু-মানুষের সাহায্যে আমরা ওঁর দেহটাকে চত্বরে বয়ে আনলাম। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিলো। দুবার আমরা কোনো অজানা পশুর গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম। একবার ছোট্ট শ্লথ জাতীয় সেই প্রাণীটা এসে খানিকক্ষণ আমাদের লক্ষ্য করে ফের উধাও হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কেউ আমাদের আক্রমণ করেনি। চত্বরের ফটকের

কাছে এসে পশু-মানুষরা বিদায় নিলো—মলিংও গেলো ওদের সঙ্গে। ফটকে তালা লাগিয়ে আমরা মোরোর দেহটাকে অঙ্গনে নিয়ে এসে একরাশ ভাঙা ডাল-পালার ওপরে শুইয়ে রাখলাম।

তারপর গবেষণাগারে ঢুকে যে কটা জীবিত প্রাণীকে পেলাম, শেষ করে ফেললাম।

মণ্টগোমেরির ছুটি

কাজটা খতম করে আমি আর মণ্টগোমেরি হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। তারপর দুজনে মিলে আমার ছোট্ট ঘরখানাতে গিয়ে এই প্রথম আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা করতে শুরু করলাম। মোরোর ব্যক্তিত্ব মণ্টগোমেরির ওপরে অদ্ভুত প্রভাব ছড়িয়ে রেখেছিলো। মোরো যে মারা যেতে পারেন, তা হয়তো মণ্টগোমেরির কখনও মনেই হয়নি। দশটা বছর কিংবা তার চাইতেও বেশি দিন এই দ্বীপের একঘেয়েমিতে বাস করে যে অভ্যেসগুলো তার প্রকৃতির অংশ হয়ে উঠেছিলো, এই দুর্ঘটনায় তার সমস্ত কিছুই যেন আচমকা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে। উনি অস্পষ্টভাবে কথাবার্তা বলছিলেন, অসরলভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, সাধারণ প্রশ্নগুলো নিয়েই চিন্তা করছিলেন বারবার।

'পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারটাই যে কি অদ্ভুত তালগোল-পাকানো!' উনি বলছিলেন, 'এতোদিন আমার সত্যিকারের জীবন বলতে কিছু ছিলো না। কবে যে এ জীবনটা শুরু হয়েছিলো, কে জানে! ষোলোটা বছর আয়া আর স্কুলের মাস্টার-মশাইরা আমাকে ইচ্ছেমতো পীড়ন করেছেন। ডাক্তারি পড়তে গিয়ে লণ্ডনে পাঁচ বছর ধরে বিধ্বস্ত হয়েছি কঠিন পরিশ্রমে—জঘন্য খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রী জায়গায় মাথা গুঁজে থাকা, জীর্ণ পোশাক—তারপর একটা মারাত্মক ভুল এবং তার ফলে এই হতচ্ছাড়া দ্বীপে নির্বাসন। দশটা বছর! কিন্তু কেন, প্রেনডিক? আমরা কি বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া বুদবুদ?'

এ ধরনের ক্ষিপ্ত-প্রলাপের কোনো জবাব দেওয়া যায় না। তাই বললাম, 'এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে, কি করে এ দ্বীপ থেকে চলে যাওয়া যায়।'

'কি লাভ হবে এখান থেকে চলে গিয়ে? আমি তো সমাজে পতিত এক অচ্ছুৎ

গান ধর : 'হায় হায় প্রেনডিক, হেরো হেরো'...হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। আবার বল : 'হায় হায় প্রেনডিক, হেরো হেরো'।...'

কালো অন্ধকার স্তূপটা এবারে পাঁচটা ছায়ামূর্তিতে বিভক্ত হয়ে চকচকে সৈকতটা ধরে ক্রমশ দূরের দিকে চলে যেতে লাগলো। ব্র্যাণ্ডির নেশায় ওরা তখন যে যার ইচ্ছেমতো চিৎকার করছিলো আর অপমানজনক উক্তি করছিলো আমার সম্পর্কে। একটু বাদেই দূর থেকে মণ্টগোমেরির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'ডাইনে ঘোর।' এবং ওরা তেমনি হট্টগোল করতে করতেই অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারে ঢুকে পড়লো। ধীরে, অতি ধীরে, সমস্ত পরিবেশ আবার নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে এলো। রাতটা আবার ভরে উঠলো নিটোল শান্ত সৌন্দর্যে। নীল নির্জন আকাশের মধ্যসীমা পেরিয়ে পূর্ণিমার ঝলমলে চাঁদটা এখন পশ্চিমে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। আমার পায়ের কাছে দেয়ালটার গজ খানেক চওড়া নিকষ অন্ধকার ছায়া। পুবদিকে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের নিবিড় ধূসর রহস্য। সমুদ্র আর ছায়াটার মাঝখানে সৈকতের ধূসর বালি-গুলো (আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে গড়ে ওঠা কাচ আর স্ফটিক) চিকচিক করছে হীরের টুকরোর মতো। আর আমার পেছনে মোমবাতির কেঁপে কেঁপে ওঠা রক্তিম তপ্ত আলো।

দরজা বন্ধ করে, তালা লাগিয়ে, আমি মোরোর শেষশয্যার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওঁর পাশেই পড়ে রয়েছে ওঁর শেষতম বলি—গোটাকতক স্ট্যাগ হাউণ্ড, একটা লামা এবং আরও কয়েকটা হতভাগ্য পশুর মৃতদেহ। অমন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর পরেও মোরোর বিশাল মুখখানা আশ্চর্য শান্ত, কঠিন চোখ দুটো নির্নিমেষে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের মৃত পাণ্ডুর চাঁদটার দিকে। ওইখানেই নোংরা জলের পাত্রটার কাছে বসে, অজস্র ভূতুড়ে-রূপোলি জ্যোৎস্না আর অমঙ্গুলে ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ভাবতে শুরু করলাম।

ঠিক করলাম, ভোরবেলা কিছু রসদপত্র সংগ্রহ করে আমি সেগুলোকে ডিঙিটাতে নিয়ে তুলবো। তারপর আমার সামনের এই চিতাটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, ফের একবার খোলা দরিয়ার সীমাহীন নির্জনতায় ভেসে পড়বো। মণ্টগোমেরির জন্যে আর কিছুই করার নেই। সত্যি বলতে কি, এখন ওই পশু-মানুষদের সঙ্গেই ওঁর মিল বেশি—মানুষের সমাজে এখন ওঁকে আর মানাবে না।

জানি না, কতোক্ষণ বসে বসে আমি আমার পরিকল্পনাগুলো ছকে নিচ্ছিলাম। নিশ্চয়ই ঘণ্টাখানেক হবে। হঠাৎ মণ্টগোমেরি ফিরে আসায় আমার ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটলো। একসঙ্গে অনেকগুলো চিৎকৃত কণ্ঠস্বর, উত্তেজিত আস্ফালন, হৈ-চৈ

হট্টগোল শুনতে পেলাম। মনে হলো সৈকত ধরে যেতে যেতে ওরা সমুদ্রের কাছে গিয়ে থেমে দাঁড়ালো। চিৎকার কলোরোলের শব্দটা ক্রমাগত ওঠা-নামা করছিলো। শুনতে পেলাম, প্রচণ্ড আঘাতে কাঠ কাটা হচ্ছে। কিন্তু তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। ফের বেসুরো গলায় গান শুরু হলো। আমিও আবার নিজের মুক্তির উপায় সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম।

হঠাৎ মনে পড়লো, ছাউনির মধ্যে কয়েকটা ছোটখাটো পিপে দেখেছিলাম। সেগুলো খুঁজে দেখার জন্যে বাতিটা নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই গোটা কতক বিস্কুটের টিন চোখে পড়লো। উৎসাহিত হয়ে একটা টিনের ঢাকা খুলে ফেললাম। কিন্তু ভেতরে লাল মতো কি একটা জিনিস দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

আমার পেছন দিকে চাঁদের আলোয় উঠোনটার কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। একরাশ ভাঙা কাঠকুটোর স্তূপের ওপরে শুয়ে রয়েছেন মোরো। তাঁর পাশে একটার পর একটা গাদাগাদি করে পড়ে রয়েছে ক্ষতবিক্ষত পশুগুলোর বিকৃত মৃতদেহ। দেখে মনে হয় যেন প্রতিহিংসা মেটাবার শেষ প্রচেষ্টায় ওরা একে অন্যকে আঁকড়ে ধরেছে। রাতের অন্ধকারের মতো কালো হাঁ করে রয়েছে মোরোর ক্ষত-স্থানগুলো। ওঁর দেহ থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত কালো হয়ে জমে রয়েছে বালির বুকে।

হঠাৎ দেখি, একটা লাল আভা যেন কোত্থেকে ঘরে ঢুকে নাচতে নাচতে উলটো দিকের দেয়ালে গিয়ে পড়লো। তখন আমি এর কোনো অর্থ বা কারণ খুঁজে পাইনি—ভেবেছিলাম ওটা আমার কেঁপে কেঁপে ওঠা বাতিটারই প্রতিবিম্ব। তাই সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফের রসদের খোঁজে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তারপর এক হাতে যতোটা সম্ভব, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো খুঁজে খুঁজে আগামী কালের জন্যে একধারে সরিয়ে রাখতে লাগলাম। আমার কাজ এগুচ্ছিলে ধীর গতিতে, কিন্তু সময় কেটে যাচ্ছিলো দ্রুত। একটু বাদেই দিনের আলো ফুটে উঠলো চারদিকে।

বাইরে তখন পশু-মানুষদের গান বন্ধ হয়ে গেছে। কেমন যেন একটা গোলযোগ চলছে ওখানে। হঠাৎ খুব হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো। চিৎকার শুনলাম, 'আরও দাও, আরও!' বাদ-প্রতিবাদের আওয়াজ এবং তারপরেই আচমকা এক তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার। গোলমালের ধারাটা তখন এতোই বদলে গেছে যে আমি উঠোনে বেরিয়ে এসে কান পেতে রইলাম। হঠাৎ তীক্ষ্ণ ছুরির মতো সেই বিভ্রান্তিকে ভেদ করে রিভলভারের গর্জন ভেসে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও একছুটে বেরিয়ে পড়লাম। বেরুতে গিয়েই শুনতে পেলাম, আমার পেছনে একগাদা প্যাকিং বাক্স আর একরাশ কাচ হুড়মুড় করে ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়লো। কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে আমি সপাটে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সৈকতে নৌকো-ঘাটার কাছে তখন উৎসবের আগুন জ্বলছে, ভোরের অস্পষ্টতায় ছিটকে উঠছে আলোর স্ফুলিঙ্গ আর অগ্নিকুণ্ডটাকে ঘিরে ধস্তাধস্তি করছে কতকগুলো আবছা ছায়ামূর্তি। শুনতে পেলাম মণ্টগোমেরি আমার নাম ধরে ডাকছেন। তৎক্ষণাৎ রিভলভারটা হাতে নিয়ে আমি ওই অগ্নিকুণ্ডটার দিকে ছুটতে শুরু করলাম। দেখলাম, মণ্টগোমেরির পিস্তলটা থেকে একবার একটা লাল জিভ লকলকিয়ে উঠলো—উনি পড়ে গেছেন। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠে আমি আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়লাম।

শুনতে পেলাম কে যেন চিৎকার করে উঠলো, 'প্রভু!' সঙ্গে সঙ্গে জটলা-বাঁধা ছায়ামূর্তিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্তত ছিটকে পড়লো, আগুনটাও একবার লাফিয়ে উঠে মিইয়ে গেলো। আকস্মিক আতঙ্কে পশু-মানুষগুলো তখন আমার সামনে দিয়ে প্রাণপণে সৈকত ধরে ছুটে পালাচ্ছে। উত্তেজনার বশে ঝোপঝাড়ের আড়ালে উধাও হতে থাকা প্রাণীগুলোর দিকে ফের গুলি চালিয়ে আমি সৈকতে পড়ে থাকা স্তূপগুলোর দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, মণ্টগোমেরি চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছেন আর ধূসর রঙের রোমশ প্রাণীটা গুঁড়ি মেরে রয়েছে ওঁর দেহের ওপরে। দানবটা মরে গিয়েও বাঁকা বাঁকা নখগুলো দিয়ে মণ্টগোমেরির গলাটা আঁকড়ে রেখেছে। পাশেই নিস্পন্দ হয়ে মুখে গুঁজে পড়ে রয়েছে মলিং, ওর ঘাড়টা কেউ কামড়ে অর্ধেক ছিঁড়ে ফেলেছে—ব্র্যাণ্ডির ভাঙা বোতলটার ওপরের অংশ তখনও ওর হাতের মুঠোয়। তা ছাড়া আরও দুজন আগুনের কাছে পড়ে রয়েছে। একজন নিথর। আর একজন কাতরাচ্ছে—মাঝে মাঝে সে আস্তে আস্তে মাথাটা তুলছে, কিন্তু পরক্ষণেই মাথাটা আবার ঢলে পড়েছে নিচের দিকে।

দানবটাকে মণ্টগোমেরির দেহ থেকে টেনে নামালাম। মণ্টগোমেরির মুখটা কালো হয়ে গেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বইছেই না। সমুদ্রের জল দিয়ে ওঁর মুখে ঝাপটা মেরে, নিজের কোটটা গুটিয়ে বালিশ বানিয়ে ওঁর মাথার নিচে পেতে দিলাম। মলিং মরে গেছে। আগুনের পাশে পড়ে থাকা আহত প্রাণীটা সেই দাড়িওলা নেকড়ে-মানুষ। দেখলাম তার দেহের ঊর্ধ্বাংশটুকু যে কাঠটার ওপরে রয়েছে সেটা তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। বেচারার আঘাত এতোই

সাংঘাতিক যে করুণার বশে আমি তৎক্ষণাৎ গুলি করে ওর ঘিলু উড়িয়ে দিলাম। অন্য প্রাণীটা সেই সাদা পোশাক পরা ষাঁড়-মানুষদের মধ্যে একজন। সেও মরে গেছে। বাকি পশু-মানুষরা পালিয়ে গেছে সৈকত থেকে।

ফের মণ্টগোমেরির কাছে গিয়ে আমি ওঁর পাশে হাঁটু মুড়ে বসলাম—ডাক্তারি শাস্ত্রে অজ্ঞতার জন্যে অভিসম্পাত জানালাম নিজেকে। আগুনটা তখন নিভে এসেছে—অবশিষ্ট রয়েছে শুধু মুঠো মুঠো ছাই আর কুণ্ডটার মাঝামাঝি জায়গায় ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা কয়েক টুকরো অঙ্গার। ভাবছিলাম এতো কাঠ মণ্টগোমেরি পেলেন কোথায়। ততোক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। আকাশ আরও ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। স্বচ্ছ নীল আকাশের বুকে পাণ্ডুর আর অনচ্ছ হয়ে উঠছে অস্তগামী চাঁদ। পুব দিগন্ত লালে লাল।

হঠাৎ কাঠ ফাটার আওয়াজ আর একটা হিসহিসে শব্দ শুনে আমি পেছন দিকে ঘুরে তাকিয়েই আতঙ্কে চিৎকার তুলে লাফিয়ে উঠলাম। দেখলাম চত্বরের ভেতর থেকে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ভোরের আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে আর সেই ঝোড়ো অন্ধকারের ভেতর থেকে লকলকিয়ে উঠছে আগুনের রক্তিম শিখা। তারপরেই চালাঘরটার ছাদে আগুন ধরে গেলো, খড়ের ঢালু ছাদ বেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলো আগুনের শিখা। এক ঝলক আগুন ছিটকে বেরুলো আমার ঘরের জানলা দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, কি হয়েছে। মনে পড়লো, ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি কিসের যেন আছড়ে পড়ার শব্দ শুনেছিলাম। আসলে মণ্টগোমেরিকে সাহায্য করতে তাড়াহুড়ো করে ছুটে বেরুতে গিয়ে আমিই বাতিটাকে উলটে ফেলেছিলাম।

চত্বরের ভেতরকার কোনো জিনিস বাঁচাবার চেষ্টা করা একেবারেই অর্থহীন। মনে পড়লো এ দ্বীপ থেকে আমার পালিয়ে যাবার পরিকল্পনার কথা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে সৈকতের যেখানে নৌকো দুটো বাঁধা থাকতো, সেদিকে তাকালাম। কিন্তু নৌকো নেই। আমার পাশে বালির ওপরে পড়ে রয়েছে দুটো কুড়ুল, ছোটো-খাটো কয়েক টুকরো কাঠ, অগ্নিকুণ্ডের ছাই আর ধোঁয়া-ওঠা কিছু অঙ্গার। আমার ওপরে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে মণ্টগোমেরি নৌকো দুটোকে কেটেকুটে জালিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমি আর কোনোদিনও মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে না পারি।

নিদারুণ রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। পায়ের কাছে অসহায়

অবস্থায় পড়ে থাকা ওই মানুষটার নির্বোধ মাথাটা গুঁড়ো করে দেবার বাসনায় আমি হাতও তুলেছিলাম প্রায়। কিন্তু তখনই ওঁর হাতটা নড়ে উঠলো—এতো দুর্বল আর এতো করুণভাবে নড়লো যে তাতেই আমার সমস্ত রাগ উধাও হয়ে গেলো। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উনি মুহূর্তের জন্যে চোখ মেলে তাকালেন।

আমি ওঁর পাশে বসে ওঁর মাথাটা তুলে ধরলাম। ফের চোখ দুটো মেলে উনি নীরবে ভোরের আকাশের দিকে, তারপর আমার দিকে তাকালেন। ফের নেমে এলো ওঁর চোখের পাতা দুটো।

'দুঃখিত,' খানিকক্ষণ বাদে যেন অনেক কষ্টে মণ্টগোমেরি বললেন। মনে হলো উনি যেন কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করছেন। তারপর অস্ফুটে বললেন, 'এই শেষ…শেষ হলো এই নির্বোধ পৃথিবীটার। কি বিশ্রী বিশৃঙ্খলা…'

আমি শুনলাম। হঠাৎ ওঁর মাথাটা অসহায়ভাবে এক পাশে হেলে পড়লো। মনে হলো একটু পানীয় পেলে হয়তো উনি সামলে উঠতে পারবেন। কিন্তু হাতের কাছে না আছে কোনো পানীয়, না আছে তা নিয়ে আসার মতো কোনো পাত্র। আচমকা ওঁর শরীরটা যেন আগের চাইতে ভারি হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো। ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো আমার বুকের ভেতরটা।

মুখের কাছে ঝুঁকে, আমি ওঁর জামার ছেঁড়া অংশের ভেতর দিয়ে বুকে হাত রাখলাম। কোনো সাড়া নেই। অথচ সেই মুহূর্তে উপসাগরের ওধার থেকে সূর্যের একটা শুভ্র তপ্ত রেখা পুব আকাশে জেগে উঠলো, রঙের আভায় তা রাঙিয়ে তুললো সারা আকাশ, নিকষ সমুদ্রটাকে ভরিয়ে তুললো চোখ-ধাঁধানো আলোর অসামান্য ঐশ্বর্যে। মণ্টগোমেরির মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখেও সেই আলো এসে ছড়িয়ে পড়লো দিব্য জ্যোতির মতো।

মণ্টগোমেরির মাথাটা আস্তে করে আমার বানিয়ে দেওয়া বালিশে নামিয়ে রেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার সামনে অসীম সমুদ্রের চোখ-ঝলসানো নিঃসঙ্গতা—যে ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতায় আমি ইতিমধ্যেই অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। পেছনে ভোরের হাওয়ায় নিশ্চুপ নিঝুম দ্বীপ—দ্বীপবাসী পশুরা এখন নীরব, দেখাও যাচ্ছে না তাদের কাউকে। ওদিকে সমস্ত রসদ আর গোলাবারুদ নিয়ে সশব্দে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে চত্বরের ভেতরটা—থেকে থেকে আচমকা জেগে উঠছে আগুনের লেলিহান শিখা, মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে কাঠ-ফাটার বা কিছু ভেঙে পড়ার আওয়াজ। ধোঁয়ার কুণ্ডলি সৈকত দিয়ে আমার কাছ থেকে

দূরে সরে যাচ্ছে, দূরের গাছপালাগুলোর মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে গিরিখাতের সেই কুটিরগুলোর দিকে। আমার পাশে শুধু নৌকো দুটোর দগ্ধাবশেষ আর পাঁচটা মৃতদেহ।

তারপর ঝোপগুলোর আড়াল থেকে তিনটে পশু-মানুষ বেরিয়ে এলো। তাদের পিঠগুলো কুঁজো, মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো, হাতগুলো বিকৃত, বন্ধুত্ববর্জিত চোখে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে একটু একটু করে তারা এগিয়ে আসতে লাগলো আমার দিকে।

পশু-মানুষদের সঙ্গে একা

একা একাই আমি ওদের সম্মুখীন হলাম—সঠিকভাবে বলতে গেলে এক হাতে, কারণ আমার একটা হাত ভাঙা। পকেটের রিভলভারে দুটো গুলির ঘর শূন্য। সৈকতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাঠের কুঁচো টুকরোগুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে সেই কুড়ুল দুটো, যা দিয়ে নৌকো দুটোকে কেটে টুকরা টুকরো করা হয়েছিলো। আমার পেছন দিক থেকে জোয়ারের জল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

এখন সাহস দেখানো ছাড়া আর কিচ্ছু করার নেই। সরাসরি আমি এগিয়ে আসা দানবগুলোর মুখের দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টি এড়িয়ে, ওরা এধারে পড়ে থাকা দেহগুলোর গন্ধ শুঁকতে লাগলো। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আমি নেকড়ে-মানুষের দেহের তলায় পড়ে থাকা রক্তমাখা চাবুকটা তুলে নিলাম।

বাতাসে চাবুকটা হাঁকড়াতেই ওরা থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালো।

বললাম, 'অভিবাদন করো, মাথা নিচু করে বসো!'

ওরা ইতস্তত করতে লাগলো। একজন হাঁটু নোয়ালো। আমার হৃৎপিণ্ডটা তখন মুখের কাছে উঠে এসেছে। তবু ফের সেই হুকুম করে, আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। একজন হাঁটু মুড়ে বসলো, তারপর অন্য দুজন।

দর্শকদের দিকে মুখ রেখে অভিনেতা যেমনভাবে মঞ্চ দিয়ে হেঁটে যায়, অনেকটা তেমনিভাবে পশু-মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে আমি মৃতদেহগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর আইন-শিক্ষকের দেহে পা রেখে বললাম, 'এরা আইন ভেঙে-ছিলো, তাই এদের খুন করে ফেলা হয়েছে। আইন-শিক্ষক, এমন কি দ্বিতীয় চাবুকধারীকেও। আইন সবার চাইতে বড়ো। এসো, দেখে যাও!'

'কেউ রক্ষা পায় না,' এগিয়ে আসতে আসতে ওদের একজন বললো।

'কেউ রক্ষা পায় না,' আমি বললাম, 'তাই আমার হুকুম শুনে চলো।'

ওরা উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নালু দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলো।

'ওখানে দাঁড়াও।' কুড়ুল দুটো তুলে নিয়ে আমি তাদের ফলা দুটো হাতের বাঁধনটার সঙ্গে ঝুলিয়ে নিলাম। তারপর মণ্টগোমেরির রিভলভারটা তুলে নিয়ে দেখি, তখনও সেটার দুটো ঘরে গুলি ভরা রয়েছে। নিচু হয়ে খুঁজতে খুঁজতে ওঁর পকেটে আরও আধ-ডজন গুলি পেয়ে গেলাম।

'ওঁকে তুলে নাও,' ফের উঠে দাঁড়িয়ে, চাবুকটা তুলে মণ্টগোমেরিকে দেখিয়ে বললাম, 'ওঁকে বয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দাও।'

ওরা এগিয়ে এলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো, মণ্টগোমেরিকে ওরা তখনও ভয় পাচ্ছে। কিন্তু আমার লাল-চাবুকের ভয় তার চাইতেও বেশি। তাই খানিকক্ষণের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব, ফের কয়েকবার চাবুকের আস্ফালন এবং চিৎকৃত হুকুমের পর ওরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মণ্টগোমেরিকে তুলে নিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলো—নেমে পড়লো সমুদ্রের ঝিলমিলে জলে।

'আরও যাও! আরও দূরে নিয়ে যাও ওঁকে।'

বাহুসন্ধি অব্দি জলে নেমে ওরা আমার দিকে ফিরে তাকালো। বললাম, 'এবারে ছেড়ে দাও।' এবং পরক্ষণেই জলের বুকে মৃদু শব্দ তুলে মণ্টগোমেরির দেহটা উধাও হয়ে গেলো। আমার বুকের ভেতরে কি যেন একটা ডেলা পাকিয়ে উঠলো। ভাঙা গলায় বললাম, 'বেশ!' ওরা ভয়ে ভয়ে তাড়াহুড়ো করে জলের ধার অব্দি উঠে এলো, তারপর আবার পেছন ফিরে সমুদ্রের দিকে তাকালো—যেন মণ্টগোমেরি প্রতিশোধ নিতে জল থেকে উঠে আসবেন।

'এবারে এগুলো', অন্য মৃতদেহগুলোকে দেখিয়ে আমি বললাম।

যেখান থেকে মণ্টগোমেরিকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিলো, এবারে ওরা সন্তর্পণে সেদিকটা এড়িয়ে গেলো—আড়াআড়িভাবে প্রায় একশো গজ এগিয়ে গিয়ে জলে ভাসিয়ে দিলো চারটে পশু-মানুষকে।

ওরা যখন মলিঙের বিকৃত দেহটা বিসর্জন দিতে নিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ পেছনে হালকা পায়ের শব্দ শুনে আমি চকিতে ঘুরে দেখি, আমার কাছ থেকে গজ বারো দূরেই সেই বিশাল হায়না-শুয়োরটা। মাথা নিচু করে সে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। মুহূর্তের জন্যে আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর চাবুকটা ফেলে দিয়ে আমি চট করে পকেট থেকে রিভলভারটা

বের করে নিলাম—কারণ এই দ্বীপে এখন ও-ই আমার সবচাইতে বড়ো শত্রু, প্রথম ছুতোতেই আমি ওকে শেষ করে ফেলতে চাইছিলাম। হয়তো এটা অন্যায়, কিন্তু সেই রকম সিদ্ধান্তই আমি নিয়েছিলাম। অন্য যে কোনো দুটো পশু-মানুষের চাইতে ওকে আমার অনেক বেশি ভয়। আমি জানতাম, ওকে বাঁচতে দেওয়া আমার জীবনের পক্ষে আশঙ্কাজনক। নিজেকে গুছিয়ে নিতে হয়তো আমার কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিলো। তারপরেই চিৎকার করে বললাম, 'মাথা নিচু কর !'

সে ঝকঝকে দাঁত বের করে হিংস্র গর্জন করে উঠলো, 'তুমি কে, যে তোমাকে দেখে আমি…'

হয়তো খানিকটা বেশি তাড়াহুড়ো করেই আমি লক্ষ্য স্থির করে গুলিটা চালিয়েছিলাম। তারপরেই দেখি সে একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে ছুটতে শুরু করেছে। বুঝতে পারলাম, আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। ফের গুলি চালাতে গিয়ে দেখি, ততোক্ষণে সে মাথা নিচু করে এধারে-ওধারে লাফাতে লাফাতে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে। তাই দ্বিতীয় গুলিটা আর নষ্ট করতে ভরসা পেলাম না। মাঝে-মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখতে দেখতে দানবটা চত্বর থেকে উঠতে থাকা ধোঁয়ার কুণ্ডলির আড়ালে উধাও হয়ে গেলো। খানিকক্ষণ আমি তার দিকেই তাকিয়ে রইলাম। তারপর আমার অনুগত পশু-মানুষ তিনটির দিকে তাকিয়ে, মলিঙের দেহটা জলে ভাসিয়ে দেবার ইঙ্গিত দিলাম এবং মৃতদেহ তিনটে যেখানে পড়েছিলো সেখানে ফিরে গিয়ে, পা দিয়ে ঘষে ঘষে বালির বুক থেকে রক্তের ছোপগুলো মুছে ফেললাম।

হাতের ইঙ্গিতে পশু-মানুষ তিনটেকে যেতে বলে, এবারে আমি সৈকত পেরিয়ে জঙ্গলটার দিকে এগুতে লাগলাম। আমার হাতে উদ্যত রিভলভার, কুড়ুল দুটোর সঙ্গে চাবুকটাও গুঁজে নিয়েছি হাতের বাঁধনের সঙ্গে। আসলে যে পরিস্থিতিতে আমি পড়েছি, সে সম্পর্কে একটু ভেবে দেখার জন্যে আমি ভীষণভাবে একা হতে চাইছিলাম তখন। আমি বুঝতে পারছিলাম সবচাইতে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে, সমস্ত দ্বীপের মধ্যে এখন এমন কোনো নিরাপদ জায়গা নেই যেখানে আমি একটু একা হয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিতে পারি বা ঘুমোতে পারি। দ্বীপে আসার পর থেকে আমি আশ্চর্যভাবে নিজের শারীরিক শক্তি ফিরে পেয়েছি, কিন্তু এখনও আমি সহজেই বিচলিত হয়ে উঠি—বেশি চাপের মুখে পড়লেই আমার শরীরটা ভেঙে পড়তে চায়। আমি বুঝতে পারছিলাম, এখন মানুষ-পশুদের কাছে আমার শ্রেষ্ঠত্বটা প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া দরকার। ওদের আস্থাভাজন হয়ে আমাকে নিজের

নিরাপত্তা গড়ে নিতে হবে। কিন্তু আমি কিছুতেই ভরসা পাচ্ছিলাম না। তাই আবার সৈকতে ফিরে গিয়ে, প্রবাল-প্রাচীরের দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা নিচু জায়গার দিকে এগুতে লাগলাম। ওখানে বসে বসে আমি চিন্তা করতে পারবো— আমার পিঠ থাকবে সমুদ্রের দিকে আর মুখ থাকবে দ্বীপের দিকে, যাতে হঠাৎ কেউ এসে আমাকে আক্রমণ করতে না পারে।

হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে আমি ওখানেই বসে পড়লাম। আমার মাথায় ওপরে প্রখর রোদ, মনে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা। ভাবছিলাম, উদ্ধার পাওয়া অব্দি (যদি আদৌ কোনোদিন উদ্ধার পাই) এ দ্বীপে আমি কি করে বেঁচে থাকবো। যথাসম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় আমি সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটা আবার নতুনভাবে ভেবে দেখার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু মনের আবেগ-অনুভূতিকে সরিয়ে রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাই মনটা অন্য জায়গায় ঘুরিয়ে নিলাম, ভাবতে লাগলাম মণ্টগোমেরির হতাশার কারণটার কথা। উনি বলেছিলেন, 'ওরা বদলে যাবে, অবশ্যই বদলে যাবে।' আর মোরো···মোরো যেন কি বলেছিলেন ? বলেছিলেন, 'দিনের পর দিন একটু একটু করে ওদের মধ্যে পশুত্বের লক্ষণগুলো আবার ফিরে আসে···।' হায়না-শুয়োরটার কথা ভেবে দেখলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি ওকে না মারলে, ওই দানবটাই আমাকে মেরে ফেলবে।···আমার দুর্ভাগ্য, আইন-শিক্ষক মরে গেছে।...এখন ওরা জেনে গেছে ওরা নিজেরা যেমন খুন হয়, চাবুকধারীদেরও তেমনি করে খুন করা যায়···

এখনও কি দূরের ওই সবুজ ফার্ণ আর পামের আড়াল থেকে ওরা আমাকে লক্ষ্য করছে, অপেক্ষা করছে আমি কতোক্ষণে ওদের নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়বো ? ওরা কি মতলব আঁটছে আমার বিরুদ্ধে ? হায়না-শুয়োর ওদের কি বলছিলো তখন ? এইভাবে আমার কল্পনা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চললো এক অর্থহীন আতঙ্কের পতিত জলাভূমিতে।

সমুদ্রের ঢেউয়ে চত্বরের কাছাকাছি সৈকতে এসে ঠেকে থাকা কি একটা কালচে পদার্থকে লক্ষ্য করে সমুদ্রপাখিদের চিৎকারে আমার চিন্তার খেই হারিয়ে গেলো। বুঝতে পারলাম ওটা কি জিনিস। কিন্তু ওখানে গিয়ে পাখিগুলোকে তাড়িয়ে দেবার মতো সাহস আমার ছিলো না। তাই জঙ্গলের আড়ালগুলোকে এড়িয়ে সৈকতের উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করলাম—যাতে অতর্কিতে কেউ আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে, যাতে আমি খানিকটা ঘুরপথে দ্বীপের পুব কোণে গিরিখাতের সেই কুটিরগুলোতে গিয়ে পৌছতে পারি।

সম্ভবত আধ মাইলটাক হাঁটার পর দেখলাম আমার সেই তিন পশু-মানুষের মধ্যে একজন তীরের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। নিজের কল্পনায় নানান কথা ভেবে আমি তখন এতোই বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম যে সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা বের করে নিলাম।

খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে তবু সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

চিৎকার করে বললাম, 'চলে যাও!'

প্রাণীটার হাবভাবে বশ-মানা কুকুরের ভীষণ মিল। বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া কুকুরের মতোই ও সামান্য একটু পেছিয়ে গিয়ে থেমে দাঁড়ালো, তারপর মিনতিভরা দুটো বাদামি চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

'চলে যাও,' বললাম, 'আমার কাছে আসবে না।'

'আপনার কাছে একটু যেতে পারি না?'

'না, চলে যাও বলছি,' আমি শূন্যে চাবুক হাঁকড়ালাম। তারপর চাবুকটা দাঁতে চেপে রেখে একটা ঢিল তুলে নিতে নিচু হলাম এবং ওইভাবে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলাম প্রাণীটাকে।

এইভাবে নির্জন পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি পশু-মানুষদের আস্তানা ওই গিরি-খাতটাতে গিয়ে পৌছলাম এবং সমুদ্র থেকে পাহাড়ের এই ফাটলটাকে আড়াল করে রাখা লতাপাতা আর শরবন-বেতবনের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে, পশু-মানুষরা এসে হাজির হবার পর ওদের হাবভাব দেখে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম, মোরো-মণ্টগোমেরির মৃত্যু আর যন্ত্রণা-ঘরের ধ্বংস ওদের ওপরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বুঝতে পারলাম, ওদের কাছে ভীরুতা দেখিয়ে আমি বোকামো করেছি। ভোরবেলাকার সাহসটা যদি আমি বজায় রাখতে পারতাম, নির্জন কল্পনায় নানান কথা ভেবে সেই সাহসটাকে যদি আমি উবে যেতে না দিতাম— তাহলে মোরোর ছেড়ে যাওয়া রাজদণ্ডটা তুলে নিয়ে আমিই হয়তো পশু-মানুষদের শাসন করতে পারতাম। কিন্তু সেই সুযোগ হারিয়ে আমি নিজেকে স্রেফ ওদের দলপতির আসনে নামিয়ে এনেছি।

দুপুরের দিকে ওদের মধ্যে কয়েকজন এসে গরম বালিতে উবু হয়ে বসে রোদ পোয়াতে লাগলো। অবশেষে খিদে-তেষ্টার জ্বালায় আমার ভয় কেটে গেলো। রিভলভারটা হাতে নিয়ে আমি ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটা নেকড়ে-মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো, তার পর অন্যরাও। ওদের মধ্যে কেউই উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন করার

চেষ্টা করলো না। ক্লান্ত দুর্বল শরীরে আমিও এতোগুলোকে তাই নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে সাহস পেলাম না। এগিয়ে যেতে যেতে প্রায় মিনতি জানাবার মতো কণ্ঠস্বরে বললাম, 'আমি খাবার চাই।'

'কুটিরে খাবার আছে,' আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে একটা ষাঁড়-শুয়োর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বললো।

ওদের পেরিয়ে আমি ছায়া আর দুর্গন্ধময় প্রায় নির্জন গিরিখাতটাতে গিয়ে ঢুকলাম—একটা শূন্য কুটিরে বসে কিছু ফলমূলও খেয়ে নিলাম। ক্লান্তিতে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিলো। প্রবেশপথটার মুখে কিছু ভাঙা ডালপালা সাজিয়ে, সেদিকে মুখ রেখে, রিভলভারটাতে হাত রেখে আমি হালকা তন্দ্রায় তলিয়ে গেলাম। ভরসা ছিলো, হঠাৎ কেউ আমাকে আক্রমণ করতে এলে শুকনো ডালপালাগুলোতে যে শব্দ হবে, তাতেই আমার ঘুম ভেঙে যাবে।

পশু-মানুষদের রূপান্তর

এইভাবে ডক্টর মোরোর দ্বীপে পশু-মানুষদের মধ্যে আমিও ওদের একজন হয়ে উঠলাম। ঘুম যখন ভাঙলো, তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ব্যাণ্ডেজের ভেতরে হাতটাতে যন্ত্রণা হচ্ছিলো। উঠে বসে প্রথমে চিন্তা করতে লাগলাম, আমি কোথায় রয়েছি। শুনতে পেলাম বাইরে কর্কশকণ্ঠে কারা যেন কথাবার্তা বলছে। তারপর দেখি আমার সাজানো প্রতিবন্ধকটা নেই, কুটিরের প্রবেশপথ সম্পূর্ণ ফাঁকা। রিভলভারটা তখনও আমার হাতেই রয়েছে।

হঠাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পেয়ে তাকিয়ে দেখি, কি একটা যেন গুটিসুটি হয়ে আমার খুব কাছেই শুয়ে রয়েছে। নিঃশ্বাস চেপে রেখে আমি ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম, ওটা কি। প্রাণীটা ক্রমাগত আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করলো। তারপর নরম, গরম আর ভিজে মতো কি একটা জিনিস যেন আমার হাতে লাগলো।

আমার শরীরের সমস্ত পেশীগুলো কুঁকড়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে হাতটা আমি টেনে নিলাম। একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসতে শুরু করে আটকে রইলো আমার গলার কাছটাতে।

রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে কর্কশ গলায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ওখানে?'

'আমি, প্রভু!'

'কে তুমি?'

'ওরা বলে, এখন আর কোনো প্রভু নেই। কিন্তু আমি জানি…আমি জানি! আপনি যাদের মেরেছিলেন, আমি তাদের দেহগুলোকে সমুদ্রে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রভু, আমি আপনার গোলাম!'

'সমুদ্রের ধারে তোমার সঙ্গেই কি আমার দেখা হয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, প্রভু।'

স্পষ্টই বোঝা গেলো প্রাণীটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য, কারণ তা না হলে ও ঘুমের মধ্যেই আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো।

'বেশ,' ফের একবার জিভ দিয়ে চেটে দেবে বলে আমি নিজের হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আমার কাছে ওর উপস্থিতির অর্থ বুঝতে পেরে আমার মনে সাহসের জোয়ার বয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্য সবাই কোথায়?'

'ওরা পাগল, ওরা বোকা।' কুকুর-মানুষ বললো, 'এখনও ওরা ওধারে বসে বলাবলি করছে, 'প্রভু মরে গেছেন, দ্বিতীয় চাবুকধারীও মরে গেছেন। আর এক-জন, যে সমুদ্রের জলে নেমে গিয়েছিলো—সে আমাদেরই মতো। এখন আমাদের কোনো প্রভু নেই, চাবুক নেই, যন্ত্রণা-ঘরও নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। আইন আমরা ভালোবাসি, আইন মেনেও চলবো। কিন্তু যন্ত্রণা, প্রভু বা চাবুক আর নেই—কোনোদিনও থাকবে না'। ওরা এই সমস্ত বলছে। কিন্তু আমি জানি প্রভু, আমি জানি!'

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে আমি কুকুর-মানুষের মাথা চাপড়ে দিলাম, 'বাঃ, বেশ!'

'শীগগিরি আপনি ওদের সবাইকে মেরে ফেলবেন।'

'হ্যাঁ, শীগগিরি—কয়েক দিন বাদেই আমি ওদের সবাইকে মেরে ফেলবো। সবাই মারা পড়বে, শুধু তুমি বাদে।'

'প্রভু যাকে মারতে চান, তাকেই মারেন।' কুকুর-মানুষের কণ্ঠস্বরে খানিকটা তৃপ্তির রেশ ফুটে ওঠে।

'সময় না হওয়া অব্দি ওরা বোকার মতোই বেঁচে থাকুক, ওদের পাপের বোঝা বেড়ে চলুক। তুমি ওদের জানতে দিয়ো না যে আমিই প্রভু।'

'প্রভুর ইচ্ছে সর্বদাই ভালো।'

'কিন্তু একজন পাপ করেছে। দেখতে পেলেই তাকে আমি মেরে ফেলবো।

যেমনি আমি তোমাকে বলবো, 'ওই যে সে'—অমনি তুমি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ··· যে সমস্ত পুরুষ আর মেয়েরা ওখানে একত্রে জড়ো হয়েছে, এখন আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

কুকুর-মানুষের দেহের আড়ালে প্রবেশপথটা মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে উঠলো। ওকে অনুসরণ করে আমি যেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিছুদিন আগে মোটামুটি ঠিক ওখানে দাঁড়িয়েই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, মোরো তাঁর স্ট্যাগ হাউণ্ডটাকে নিয়ে আমাকে তাড়া করে আসছেন। কিন্তু এখন রাত্রি, আমার চারদিকে দুর্গন্ধে ভরা গিরিখাতটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। দূরে রোদ-ঝলমলে সবুজ ঢালটার জায়গায় আমি দেখতে পেলাম একটা লাল অগ্নিকুণ্ড—তার সামনে ইতস্তত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কয়েকটা পিঠ-কুঁজো ছায়ামূতি। দূরে অন্ধকার গাছের সারি, ওপরের ডালপালাগুলো যেন তার ওপরে কালো লেসের একটা ঝালর মেলে রেখেছে। গিরিখাতের প্রান্ত দিয়ে চাঁদটা সবেমাত্র উঠে এসেছে—দ্বীপের আগ্নেয়-মুখগুলো থেকে সর্বদা উঠে আসা একরাশ বাষ্পের রেখা চাঁদের মুখে যেন একটা দাগ টেনে দিয়েছে।

নিজেকে সাহস দেবার জন্যে আমি কুকুর-মানুষকে বললাম, 'আমার সঙ্গে সঙ্গে চলো।' কুটিরগুলোর ভেতর থেকে আমাদের দিকে উঁকি মারতে থাকা ছায়ামূর্তি-গুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, সরু পথটা দিয়ে আমরা দুজনে পাশাপাশি এগুতে লাগলাম।

আগুনের কাছাকছি যারা ছিলো, তারা কেউই আমাকে অভিবাদন করার চেষ্টা করলো না। অনেকেই আমাকে অবজ্ঞা করলো—যেন বড়াই করেই অবজ্ঞার ভান দেখালো। চারদিকে তাকিয়েও আমি হায়না-শুয়োরকে দেখতে পেলাম না। সর্বসমেত বোধহয় জন-কুড়ি পশু-মানুষ উবু হয়ে বসে আগুনের দিকে তাকিয়েছিলো অথবা কথা বলছিলো পরস্পরের সঙ্গে।

'তিনি মরে গেছেন, মরে গেছেন—প্রভু মরে গেছেন।' আমার ডান দিক থেকে বানর-মানুষ বলে উঠলো, 'যন্ত্রণা-ঘর···যন্ত্রণা-ঘর আর নেই।'

'তিনি মরেননি, উঁচু গলায় আমি বললাম, 'এখনও তিনি আমাদের লক্ষ্য করছেন।'

কথাটা শুনে ওরা চমকে উঠলো। বিশজোড়া চোখ লক্ষ্য করতে লাগলো আমাকে। আমি বললাম, 'যন্ত্রণা-ঘর এখন নেই, কিন্তু আবার হবে। প্রভুকে তোমরা দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু এখনও তিনি ওপর থেকে তোমাদের কথা শুনছেন।'

'ঠিক, ঠিক,' কুকুর-মানুষ বললো।

আমার দৃঢ় উক্তিতে ওরা বিচলিত হয়ে উঠলো। কোনো পশু হিংস্র বা যথেষ্ট ধূর্ত হতে পারে, কিন্তু একমাত্র মানুষই পারে মিথ্যে কথা বলতে।

একজন বললো, 'হাতে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা-মানুষটা অদ্ভুত কথা বলছে।'

'আমি ঠিকই বলেছি। বললাম, 'যন্ত্রণা-ঘরের প্রভু আবার ফিরে আসবেন। আইন যে ভাঙবে, তার কপালে অশেষ দুঃখ।'

ওরা বিস্মিত দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলো। আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে একটা কুড়ুল দিয়ে মাটিতে কোপ মারতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম, আমি মাটির বুকে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করছি ওরা তা দেখছে।

এক সময় ছাগল-মানুষ একটা সন্দেহ প্রকাশ করলো। আমি তাকে জবাব দিলাম। তারপর গায়ে ফুটকি-ফুটকি-দাগওলা একটা প্রাণী আপত্তি জানালো। ক্রমে আগুনটাকে ঘিরে রীতিমতো তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। প্রতি মুহূর্তেই আমি নিজের আপাত-নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও বেশি করে নিশ্চিত হয়ে উঠছিলাম। প্রথম দিককার মতো তখন আমি আর কথা বলতে বলতে প্রচণ্ড উত্তেজনায় বেদম হয়ে উঠছি না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেশ কয়েকজন আমার কথাটাকে সত্যি বলে মেনে নিলো আর বাকিরা রইলো সন্দেহে দোলায়িত অবস্থায়।

আমার শত্রু হায়না-শুয়োরের জন্যে আমি সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি মেলে রেখেছিলাম, কিন্তু তার আর দেখা মিললো না। মাঝে মাঝেই এক একটা সন্দেহজনক গতিবিধি আমাকে চমকে দিচ্ছিলো, কিন্তু অতি দ্রুত আমার মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠলো। তারপর চাঁদটা যখন মাঝ-আকাশ থেকে ঢলে পড়লো, তখন শ্রোতারা একে একে হাই তুলতে শুরু করলো (নিভু নিভু আগুনের আভায় অদ্ভুত দাঁতগুলো বের করে)। প্রথমে একজন, তারপর আর একজন—এমনি করে ওরা ফিরতে লাগলো গিরিখাতে নিজেদের ডেরায়। নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারের ভয়ে আমিও ওদের সঙ্গী হলাম—কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম, একা থাকার চাইতে ওদের কয়েকজনের মধ্যে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ।

এইভাবে ডক্টর মোরোর দ্বীপে আমার দিন-যাপনের দীর্ঘতর পর্যায়টি শুরু হলো। কিন্তু সেই রাতটা থেকে শুরু করে শেষের মুহূর্তটি পর্যন্ত শুধু অসংখ্য ছোটো-খাটো অপ্রীতিকর ঘটনা আর একটানা বিরক্তিকর অস্বস্তি ছাড়া উল্লেখযোগ্য এমন কিছুই ঘটেনি, যা বিশদভাবে লিখে রাখা যায়। অথচ স্মৃতির গভীরে এমন

অনেক কিছুই রয়ে গেছে যা আমি লিখে রাখতে পারতাম, যা ভোলার জন্যে আমি উৎসাহী-আগ্রহে নিজের ডান হাতটা তুলে ধরতে রাজি আছি সর্বদা—কিন্তু তাতে আমার কাহিনীর কিছু স্থবিধে হবে না। ভাবতে অবাক লাগে, কি করে আমি অতো তাড়াতাড়ি ওই দানবগুলোর জীবনধারার সঙ্গে মিশে গিয়েও ফের আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলাম। বিবাদ-বিসংবাদ অবশ্যই হয়েছে এবং এখনও আমি নিজের দেহে কয়েকটা দাঁতের দাগ দেখাতে পারি। কিন্তু ঢিল ছোঁড়ার কুশলতা এবং কুড়ুলের আঘাতের জন্যে খুব শীঘ্রই আমি ওদের কাছ থেকে পুরোপুরি সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পেরেছিলাম। সেণ্ট বার্নার্ড কুকুর-মানুষের প্রভুভক্তি আমার অশেষ উপকারে লেগেছে। আমি বুঝতে পেরেছি, ওদের কাছে সম্মানের মাপকাঠি প্রধানত নির্মম আঘাত হানার ক্ষমতার উপরেই নির্ভরশীল। বিভিন্ন সময়ে ওদের মধ্যে দু-একজনকে আমি হয়তো খানিকটা বিশ্রীভাবেই মেরে বসেছি, কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রাখলেও ওরা তা প্রকাশ করেছে আমার পেছনে বিকৃত অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে—আমার ঢিলের নাগাল থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে।

হায়না-শুয়োর আমাকে এড়িয়ে চলতো, আমিও সর্বদা তার সম্পর্কে সতর্ক হয়ে থাকতাম। আমার সমস্ত-সময়ের-সঙ্গী কুকুর-মানুষ তাকে নিদারুণ ঘৃণা করতো, ভয়ও করতো তেমনি। শীগগিরই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দানবটা রক্তের আস্বাদ পেয়েছে এবং সেও চিতা-মানুষের পথে চলেছে। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে, সে সেখানে একা একা বাস করে। একবার সমস্ত পশু-মানুষকে আমি তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটি মাত্র উদ্দেশ্যে তাদের সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলার মতো ক্ষমতা আমার ছিলো না। বারবার আমি তার আশ্রয়ের কাছে গিয়ে তাকে অসতর্ক অবস্থায় পাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রতিবারই সে আমাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে গেছে। প্রতিটি বনপথ সে আমার পক্ষে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে ওত পেতে থেকেছে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। কুকুর-মানুষও তাই আমার সঙ্গ ছেড়ে যেতে ভরসা পেতো না কখনও।

প্রথম দিকে মাসখানেক পশু-মানুষরা তাদের পরবর্তী অবস্থার তুলনায় রীতিমতো মানুষের পর্যায়েই ছিলো। এমন কি কুকুর-মানুষ ছাড়া ওদের মধ্যে আরও দু-একজনকে আমি মোটামুটি বন্ধু বলেই মেনে নিয়েছিলাম। আমার ওপরে ছোট্ট শ্লথটারও কেমন যেন একটা অদ্ভুত মমতা জেগে উঠেছিলো—সব সময় সে

আমার পেছন পেছন ঘুরতো। কিন্তু বানর-মানুষটা আমাকে বিরক্ত করে তুলতো। নিজের হাতে পাঁচটা আঙুল থাকায় সে ধরেই নিয়েছিলো সে আমার সমান। অনর্গল সে আমার কাছে বকবক করতো, যার অধিকাংশ কথাই অর্থহীন। ওর একটা ব্যাপারে আমার খানিকটা মজা লাগতো। নতুন নতুন শব্দ তৈরি করার ব্যাপারে এক অদ্ভুত দক্ষতা ছিলো ওর। মনে হয় ও ভাবতো, অর্থহীন বকবকানি একটা দারুণ কৃতিত্বের বিষয়। দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কথাবার্তাকে ও বলতো, 'ছোটো চিন্তা'। আর তার সঙ্গে প্রভেদ দেখাবার জন্যে নতুন নতুন অর্থহীন কথামালাকে বলতো, 'বড়ো চিন্তা'। আমার কোনো মন্তব্য বুঝতে না পারলে, ও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো, ফের আমাকে কথাটা বলতে বলতো, তারপর সেটা মুখস্থ করে নিয়ে ঠাণ্ডা মেজাজের পশু-মানুষদের কাছে যত্রতত্র ভুলভালভাবে বারবার সেটা উগরে যেতো। সাধারণ এবং বোধগম্য কোনো বিষয় নিয়ে ও কোনো চিন্তা-ভাবনা করতো না। শুধুমাত্র ওর ব্যবহারের জন্যেই আমি কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত 'বড়ো চিন্তা' আবিষ্কার করেছিলাম। এখন মনে হয়, ওর মতো নির্বোধ প্রাণী আমি আর দুটি দেখিনি। বানরের স্বভাবসুলভ মূর্খতা এতোটুকুও না হারিয়ে, মানুষের বৈশিষ্ট্যগত নির্বুদ্ধিতা ও চমৎকারভাবে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলো।

এগুলো হচ্ছে ওই পশুগুলোর মধ্যে আমার নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের প্রথম কয়েক সপ্তাহের কথা। ওই সময়টাতে ওরা আইনের রীতিনীতিগুলোকে সম্মান করে চলতো, ভদ্রসম্মতভাবে শৃঙ্খলাও বজায় রাখতো। অবিশ্যি একদিন আমি ফের একটা খরগোশের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখতে পেয়েছিলাম—আমার স্থির বিশ্বাস, কাজটা হায়না-শুয়োরের—কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু হয়নি। তবে মে মাস নাগাদ আমি প্রথম স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, ওদের কথাবার্তা এবং চালচলনের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে, উচ্চারণে জড়তা এসেছে, কথা বলায় অনিচ্ছা জেগেছে। আমার বানর-মানুষের বকবকানির মাত্রা বেড়ে গেছে, কিন্তু ক্রমশ তা আরও বেশি করে অর্থহীন আবোল-তাবোল হয়ে উঠছে। অনেকেই যেন কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে লাগলো, যদিও তখনও ওরা আমার কথা বুঝতে পারতো। এক সময়ের পরিষ্কার ভাষা, স্পষ্ট উচ্চারণ ক্রমশ বিকৃত হয়ে ফের অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি হয়ে উঠছে—ভাবতে পারেন ? ক্রমে সোজা হয়ে হাঁটতেও ওদের কষ্ট বেড়ে উঠতে লাগলো। স্পষ্টতই ওরা নিজেরাও এতে লজ্জা পেতো—কিন্তু প্রায়ই আমি দেখতে পেতাম ওদের মধ্যে কেউ না কেউ আঙুলে ভর রেখে ছুটছে, সোজা হয়ে

সঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছে না। হাত দিয়ে কোনো জিনিস ধরতে ওদের অসুবিধে হতো, ওরা জল শুষে খেতে লাগলো, শক্ত জিনিস খেতে লাগলো পশুর মতো ক্রমাগত চিবিয়ে চিবিয়ে। মোরো আমাকে বলেছিলেন, 'পশুত্বের লক্ষণ'—এতোদিনে আমি তার অর্থ আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম। ওরা ফিরে যাচ্ছে, অতি দ্রুত ওরা আবার পেছনের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

ওদের মধ্যে কেউ কেউ—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাকৃতভাবে—স্বাভাবিক-শোভনতার বিধিনিষেধগুলোকে অবজ্ঞা করতে শুরু করলো। অবাক বিস্ময়ে আমি লক্ষ্য করলাম, পথিকৃতদের সকলেই স্ত্রীজাতির। অন্যেরা এক বিবাহের প্রথাকে খোলাখুলি ভাবেই আক্রমণ করার চেষ্টা করতে লাগলো। আইনের ঐতিহ্য স্পষ্টতই শিথিল হয়ে এলো। আমার কুকুর-মানুষ একটু একটু করে আবার কুকুর হয়ে গেলো—দিনে দিনে সে ক্রমশ মূক, চতুষ্পদ আর রোমশ হয়ে উঠলো। কবে যে আমার সেই ডান হাতের সঙ্গীটি স্রেফ একটা অনুসরণকারী কুকুর হয়ে উঠলো, তা আমি প্রায় লক্ষ্যই করিনি। ওদের মাথা গোঁজার আশ্রয়-গুলিকে আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি। কিন্তু চারদিকের বিশৃঙ্খলা ক্রমশ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আমার কাছে এতোই বিরক্তিকর হয়ে উঠলো যে আমি মোরোর চত্বরে অঙ্গার হয়ে ওঠা ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই লতাপাতা দিয়ে বাসযোগ্য একটা ঝুপড়ি বানিয়ে নিলাম। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যন্ত্রণার কিছুটা স্মৃতি অম্লান রয়ে যাওয়ায় ওই জায়গাটা তখনও পশু-মানুষদের কাছ থেকে সব চাইতে বেশি নিরাপদ।

ওই দানবগুলোর অবনতির প্রতিটি ধাপ বিশদভাবে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বলা সম্ভব নয় দিনের পর দিন কিভাবে ওদের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য মুছে যেতে লাগলো, কিভাবে অবশেষে ওরা সুতোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলো, কিভাবে ওদের অনাবৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রোম গজাতে শুরু করলো, আর কিভাবেই বা ওদের কপাল বসে গিয়ে চিবুকগুলো সামনের দিকে ঠেলে উঠতে লাগলো। আমার নিঃসঙ্গতার প্রথম মাসটিতে ওদের কয়েকজনের যে প্রায়-মানুষী অন্তরঙ্গতা আমি মেনে নিয়েছিলাম, কি করে যে সেই স্মৃতির অনুস্মরণ আমার কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো তাও আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব।

পরিবর্তনটা আসছিলো ধীরে এবং অনিবার্যভাবে। ওদের এবং আমার কাছেও ওদের ওই পরিবর্তন কোনো সুনির্দিষ্ট চমক বয়ে আনেনি। তখনও আমি

নিরাপদেই ওদের মধ্যে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আমার ভয় হতে লাগলো, এবারে নিশ্চয়ই সেই চমকটা আসবে। সেন্ট বার্নার্ড কুকুর-মানুষ আমার পেছন পেছন চত্বরের ভেতরে এসে ঢুকতো। তার পাহারায় খানিকটা নিশ্চিন্ত মনেই আমি কিছু সময় ঘুমোতে পারতাম। ছোট্ট শ্লথটা আমার সঙ্গ ছেড়ে ফের তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়েছিলো—গাছের ডালে ডালে ঘুরেই সে দিন কাটায়। পশু-বশকারীরা যেমন এক খাঁচায় আবদ্ধ বিভিন্ন জন্তুর 'সুখী পরিবার' দেখিয়ে বেড়ায়, আমাদেরও তখন ঠিক তেমনি অবস্থা।

অবিশ্যি পাঠক চিড়িয়াখানায় যেমনটি দেখে থাকেন, এই প্রাণীগুলো তখনও ঠিক ততোটা পশুর পর্যায়ে নেমে যায়নি—তখনও এরা সাধারণ ভালুক, নেকড়ে, বাঘ, ষাঁড়, শুয়োর বা বনমানুষ হয়ে ওঠেনি। ওদের প্রত্যেকের মধ্যেই খানিকটা অদ্ভুত ব্যাপার রয়ে গেলো। ওদের প্রত্যেকের মধ্যেই মোরো এক পশুর সঙ্গে অন্য কোনো পশুর মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। কারুর দেহের বেশির ভাগটাই হয়তো ভালুকের, কারুর বেড়ালের, কারুর বা ষাঁড়ের—কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই অন্য কোনো জন্তুর ছাপ রয়ে গেছে। ওদের মধ্যে প্রায় খসে পড়া মনুষ্যত্বের লক্ষণ তখনও মাঝে-মধ্যেই আমাকে চমকে দিতো—কেউ কেউ হয়তো মুহূর্তের জন্যে কথা বলার শক্তি ফিরে পেতো, আবার কারুর মধ্যে হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেতাম সোজা হয়ে হাঁটার করুণ প্রচেষ্টা।

আমার মধ্যেও নিশ্চয়ই অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু পরিবর্তন এসেছিলো। আমার গায়ে ঝুলতো ছেঁড়া-ফাটা নোংরা পোশাক, তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতো গায়ের রোদে-পোড়া চামড়া। মাথার চুলগুলো লম্বা হয়ে জট বেঁধে গিয়েছিলো। শুনতে পাই এখনও নাকি আমার চোখে এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা রয়ে গেছে, রয়ে গেছে চকিত আর সতর্ক দৃষ্টি-ভঙ্গিমা।

প্রথম দিকে আমি দিনের বেলাটা দক্ষিণ দিকের সৈকতে জাহাজের প্রতীক্ষায় বসে থাকতাম। আশা করতাম কোনো জাহাজ আসবে, জাহাজের জন্যে প্রার্থনা জানাতাম ঈশ্বরের কাছে। ভেবেছিলাম বছর ঘুরলে ইপিকাকুয়ানহা হয়তো এদিক দিয়েই ফিরবে, কিন্তু সে আর কোনোদিনই ফিরলো না। পাঁচ বার আমি জাহাজের পাল দেখলাম, ধোঁয়া দেখলাম তিনবার। কিন্তু কেউই দ্বীপের কূলে এসে ভিড়লো না। সৈকতে আমি সর্বদাই আগুন জ্বেলে রাখতাম, কিন্তু দ্বীপটার আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে পরিচিতি থাকায় কেউই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতো না।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ আমি একটা ভেলা তৈরি করার কথা চিন্তা করতে শুরু করলাম। ততোদিনে আমার ভাঙা-হাতটা সেরে গেছে, দুটো হাতই কার্যক্ষম। কিন্তু প্রথমটাতে দেখলাম, এ কাজে আমি নেহাতই অক্ষম। জীবনে কোনোদিন ছুতোরের কাজ করিনি, তাই দিনের পর দিন শুধু পরীক্ষামূলকভাবে গাছ কেটে কেটে বাঁধা অভ্যেস করতে লাগলাম। দড়ি ছিলো না, এমন কিছুও খুঁজে পেলাম

না যা দিয়ে দড়ির কাজ চালানো যায়। দ্বীপের অপর্যাপ্ত লতানো গাছগুলোকে তেমন শক্ত বলে মনে হলো না এবং আমার যৎকিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্যে আমি সেগুলোকে তেমন শক্ত করে নেবার মতো কোনো উপায়ও আবিষ্কার করতে পারলাম না। কাজে লাগানোর উপযোগী পেরেক বা অন্য কোনো ধাতব পদার্থের খোঁজে চত্বরের ভেতরকার পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপ আর সৈকতে নৌকো-পোড়ানোর জায়গাটা হাতড়ে হাতড়ে দিন পনেরো কাটিয়ে দিলাম। মাঝে মাঝেই কোনো পশু-মানুষ এসে আমাকে লক্ষ্য করতো, কিন্তু আমি ডাকলেই লাফাতে লাফাতে পালিয়ে যেতো। তারপর শুরু হলো বর্ষা—প্রবল বৃষ্টি আর বজ্রপাতে আমার কাজের অনেক ক্ষতি হলো বটে, কিন্তু শেষ অব্দি ভেলাটা তৈরি হয়ে গেলো।

ভেলাটা দেখে আমার মন খুশিতে ভরে উঠলো। কিন্তু কিছুটা বাস্তব জ্ঞানের অভাবে ভেলাটা আমি তৈরি করেছিলাম সমুদ্র থেকে প্রায় মাইলখানেক বা তার চাইতেও দূরে। তাই সৈকত অব্দি টেনে আনার আগেই ভেলাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। হয়তো তাতে ভালোই হয়েছিলো, ওই ঠুনকো ভেলা নিয়ে আমাকে সমুদ্রে ভাসতে হয়নি। কিন্তু বিফলতার বেদনা আমার মনে তখন এতো তীব্র হয়ে বেজেছিলো যে কিছুদিন আমি শুধু অবসন্নের মতো সৈকতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি আর জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃত্যুর কথা ভেবেছি।

কিন্তু আসলে আমি মরতে চাইনি এবং একদিন একটা ঘটনা এভাবে হেলায় দিন কাটানো সম্পর্কে আমাকে নির্ভুলভাবে সতর্ক করে দিলো—কারণ পশু-মানুষদের কাছ থেকে আমার বিপদের আশঙ্কা ক্রমশই বেড়ে উঠছিলো। সেদিন চত্বরের পাঁচিলের ছায়ার শুয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছি, হঠাৎ গোড়ালিতে কিসের একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগতেই চমকে উঠে দেখি ছোট্ট শ্লথটা চোখ পিটপিট করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বহুদিন আগেই সে কথা বলার শক্তি এবং চটপটে চলন-ভঙ্গিমা হারিয়ে ফেলেছে, তার গায়ের লোমগুলো ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে, হাতের থাবা হয়ে উঠেছে আরও বিকৃত। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে দেখে সে একটা অস্ফুট আওয়াজ তুলে ঝোপগুলোর দিকে একটু এগিয়ে গেলো, তারপর ফিরে তাকালো আমার দিকে। প্রথমে আমি তার মতলবটা বুঝতে পারিনি, তারপরেই মনে হলো আমাকে সে পেছন পেছন যেতে বলছে। জঙ্গলে ঢুকেই সে গাছে উঠে পড়লো, কারণ মাটিতে হাঁটার চাইতে লতানো গাছ ধরে ঝুলে ঝুলেই সে এখন বেশি তাড়াতাড়ি এগুতে পারে।

হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছেই আমি সেই বীভৎস দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। দেখলাম, আমার সেন্ট বার্নার্ড কুকুর-মানুষটা মরে পড়ে রয়েছে, তার দেহের সামনে উবু হয়ে বসে হায়না-শুয়োর থাবা দিয়ে তার কেঁপে-কেঁপে ওঠা দেহটাকে চেপে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস খাচ্ছে আর মনের আনন্দে মৃদু গর্জন

করছে। আমাকে এগুতে দেখেই দানবটা জ্বলন্ত চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালো, তারপর রক্তমাখা দাঁতগুলো বের করে গর্জন করে উঠলো হিংস্র ভঙ্গিতে। আমাকে দেখে সে এতোটুকু ভয় পায়নি বা লজ্জাও পায়নি। মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকুও তার ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আমি আরও এগিয়ে গেলাম, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে বের করে নিলাম রিভলভারটা। অবশেষে এতোদিন বাদে আমি ওর মুখোমুখি হলাম।

পিশাচটা পালিয়ে যাবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ করলো না। কিন্তু তার কান দুটো পেছন দিকে টান টান হয়ে উঠলো, গায়ের রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠলো আর শরীরটা গুটিয়ে নিলো সম্পূর্ণ ওত পাতার ভঙ্গিমায়। তার চোখ দুটোর মাঝখানে লক্ষ্য স্থির করে আমি গুলি চালালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা আমার ওপরে লাফিয়ে পড়লো, আমি ছিটকে পড়লাম মাটিতে। তার দেহের পেছনের অংশটা আমার দেহের ওপরে পড়েছিলো—কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি যেখানে চেয়ে-ছিলাম গুলিটা ঠিক তার সেখানেই লেগেছিলো, তাই শূন্যে থাকা অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। কোনো রকমে তার শরীরের নিচ থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এসে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম, তাকালাম ওর কেঁপে কেঁপে ওঠা দেহটার দিকে। এই বিপদটা অন্তত কেটে গেছে। কিন্তু আমি জানতাম, এ ধরনের পরবর্তী বিপদগুলোর মধ্যে এটা সবেমাত্র প্রথম।

ভাঙা ডালপালাগুলো দিয়ে চিতা সাজিয়ে লাশ দুটোকে পুড়িয়ে দিলাম। এবারে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এ দ্বীপ ছেড়ে না গেলে আমার মৃত্যু একেবারে নিশ্চিত—শুধু সময়ের প্রশ্ন···দুদিন আগে বা পরে। ইতিমধ্যে দু-একজন ছাড়া সমস্ত পশু-মানুষই গিরিখাতের কুটিরগুলো ছেড়ে বনে জঙ্গলে নিজেদের অভিরুচি মতো আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। দিনের বেলায় কেউ বড়ো একটা বেরোয় না, অনেকেই তখন ঘুমোয়—তখন নতুন কেউ এলে মনে করবে দ্বীপে কোনো জনপ্রাণী নেই। কিন্তু রাতের বাতাস তাদের চিৎকারে-গর্জনে বীভৎস হয়ে ওঠে। এক-একবার ইচ্ছে হতো ফাঁদ পেতে বা ছুরি দিয়ে ওদের সবাইকে শেষ করে ফেলি। যথেষ্ট গুলি থাকলে আমি নির্দ্বিধায় ওদের খুন করতে শুরু করতাম। বিপজ্জনক মাংসাশী প্রাণী আছে বড়োজোর গোটা কুড়ি—এদের মধ্যে যারা বেশি সাহসী তারা ইতি-মধ্যেই মরেছে। আমার শেষ বন্ধু কুকুর-মানুষের মৃত্যুর পর আমিও কিছুটা দিনে-ঘুমোনো অভ্যেস করতে লাগলাম, যাতে রাত্রিবেলা জেগে নিজেকে পাহারা দিতে পারি। চত্বরের পাঁচিলের মধ্যেই আমি নিজের জন্যে এমন একটা আশ্রয়স্থল তৈরি করে নিয়েছিলাম যার প্রবেশপথটা ভীষণ সঙ্কীর্ণ, যাতে কেউ সেখানে ঢুকতে গেলেই যথেষ্ট আওয়াজ হয়। প্রাণীগুলো ইতিমধ্যে আগুনের ব্যবহারও ভুলে গেছে, আগুন দেখলে এখন ওরা আগের মতোই ভয় পায়। নিজের উদ্ধারের জন্যে এবারে ফের আমি একটা ভেলা তৈরি করার দিকে মন দিলাম। কিন্তু

দেখলাম তাতে হাজারটা ঝামেলা। মিস্ত্রি হিসেবে আমি একেবারেই অদক্ষ। তবু প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে একদিন সব বাধাই কাটিয়ে উঠলাম, একমাত্র সমস্যা রইলো জলের পাত্র নিয়ে। অকূলে ভাসতে হলে জল নিয়ে যাওয়া বিশেষ দরকার, কিন্তু জলের কোনো পাত্রই কোথাও খুঁজে পেলাম না। হয়তো নিজেই মাটি দিয়ে কোনো পাত্র তৈরি করে নেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমস্ত দ্বীপটাতে মাটি বলে কোনো পদার্থ নেই। পাগলের মতো আমি তখন দ্বীপটাতে খুঁজে খুঁজে বেড়াতাম, প্রাণপণে চেষ্টা করতাম যদি কোনোক্রমে এই শেষ সমস্যাটার সমাধান করা যায়, কখনও বা উন্মত্ত ক্রোধে কোনো নিরীহ গাছে কুড়ুলের আঘাত বসিয়ে দিতাম—কিন্তু কিছুতেই কিছু ভেবে উঠতে পারতাম না।

তারপর এলো এক আশ্চর্য দিন। হঠাৎ সমুদ্রের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আমি একটা জাহাজের পাল দেখতে পেলাম—মনে হলো ছোট্ট কোনো স্কুনারের পাল। সঙ্গে সঙ্গে শুকনো ডালপালার একটা বিরাট স্তূপে আগুন জেলে, আমি সেই আগুনের তাপ আর দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম। খিদে তেষ্টা ভুলে একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। পশুগুলো এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বোধহয় অবাক হয়েই চলে গেলো। রাতের অন্ধকার এসে যখন পালটাকে গ্রাস করে ফেললো, নৌকোটা তখনও অনেক দূরে। সারারাত অনেক পরিশ্রমে আমি আগুনটাকে উজ্জ্বল করে জেলে রাখলাম্ আর পশুগুলোর বিস্মিত দৃষ্টি জ্বলজ্বল করতে লাগলো অন্ধকারের আনাচে-কানাচে। ভোরবেলা দেখলাম পালটা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে এবং আরও দেখলাম ওটা একটা ছোট্ট নৌকোর নোংরা পাল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ দুটো তখন এতো ক্লান্ত হয়ে উঠেছে যে আমি যেন চোখে দেখেও দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখলাম, দুটো লোক নৌকোয় নিচু হয়ে বসে রয়েছে—একজন গলুইয়ের কাছে আর একজন হালে। কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুতভাবে ভেসে আসছে নৌকোটা···বাতাসের দিকে মুখ নেই, সর্পিল গতিতে চলে যাচ্ছে দূরের দিকে।

দিনের আলো ভালো করে ফুটে উঠতে আমি গা থেকে শতছিন্ন কোটটা খুলে, ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্রাণপণে নাড়তে লাগলাম। কিন্তু ওরা আমাকে লক্ষ্যই করলো না, একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে আগের মতোই বসে রইলো নির্বিকার ভঙ্গিতে। তীরের শেষ প্রান্ত অব্দি এগিয়ে গিয়ে আমি হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে ওদের ডাকতে লাগলাম। ওরা কোনো সাড়া দিলো না, নৌকোটা আগের মতোই উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ধীরে অতি ধীরে এগুতে লাগলো উপসাগরের দিকে। হঠাৎ বিশাল একটা সাদা পাখি নৌকোটা থেকে আকাশে উড়ে গেলো, অথচ ওরা কেউই এতোটুকু নড়লো না—কেউ যেন লক্ষ্যই করেনি দৃশ্যটা। বৃত্তাকারে উড়তে উড়তে পাখিটা একসময় বলিষ্ঠ ডানা দুটো মেলে দূরের দিকে উধাও হয়ে গেলো।

আমি তখন চিৎকার থামিয়ে দুই স্তব্ধ করপুটে চিবুকটা রেখে, বসে বসে ওদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে একটু একটু করে নৌকোটা পশ্চিম দিকে চলে যেতে লাগলো। ইচ্ছে করছিলো সাঁতার কেটে নৌকোটার দিকে এগিয়ে যাই, কিন্তু একটা অস্পষ্ট ভীতিবোধ আমাকে পেছনে টেনে রাখলো। বিকেল বেলায় জোয়ার স্রোতে নৌকোটা চত্বরের পশ্চিম দিকে প্রায় একশো গজ দূরে এসে ঠেকলো।

নৌকোর লোক দুটো কেউই জীবিত ছিলো না—এতোদিন আগে ওরা মরে গিয়েছিলো যে আমি নৌকোটা এক পাশে কাত করে ওদের টেনে নামাতে যেতেই ওদের দেহগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ওদের একজনের মাথায় একরাশ লাল চুল—ঠিক ইপিকাকুয়ানহার ক্যাপটেনের মতো। নৌকোর তলিতে নোংরা একটা সাদা টুপিও পড়ে ছিলো। আমি যখন নৌকোটার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তখন তিনটে পশু-মানুষ ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমার দিকে এগিয়ে এলো। ওদের দেখে এক নিবিড় বিতৃষ্ণায় আমার সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট নৌকোটাকে ঠেলে জলে নামিয়ে আমি তাতে উঠে বসলাম। ওদের মধ্যে নেকড়ে-মানুষ দুটো জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে নাক কুঁচকে আমার দিকে তেড়ে আসছিলো। তৃতীয়টা ছিলো ভালুক আর ষাঁড়ে মেশানো একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী, যার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ওদের ওভাবে দাঁত বের করে গর্জন তুলে এগিয়ে আসতে দেখে এবারে ঘৃণার বদলে এক নিদারুণ আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। ওদের দিকে পেছন ঘুরিয়ে আমি সমুদ্রের দিকে নৌকো বাইতে শুরু করলাম, কিছুতেই আর পেছনে ফিরে তাকাতে পারলাম না।

সেদিন পাহাড় আর দ্বীপের মাঝখানে রাতটা কাটিয়ে, পরদিন ভোরবেলা আমি ঘুর-পথে গিয়ে নদী থেকে নৌকোর জলের পাত্রটা ভরে নিয়ে এলাম। তারপর যথাসাধ্য ধৈর্য বজায় রেখে কিছু ফলমূল সংগ্রহ করলাম। অবশিষ্ট তিনটে গুলির সাহায্যে দুটো খরগোশও মেরে নিলাম। এই সমস্ত কাজ করার সময় পশু-দানবদের ভয়ে নৌকোটাকে আমি দ্বীপের দিকে ঢুকে আসা পাহাড়টার খাঁজে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

নিঃসঙ্গ মানুষ

সন্ধ্যাবেলায় যাত্রা শুরু করে, দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে আসা হালকা বাতাসে আমি আস্তে আস্তে একটু একটু করে খোলা দরিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ক্রমশ দ্বীপটা ছোটো হয়ে যেতে লাগলো, দ্বীপের বুক থেকে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার

রেখাটা হালকা থেকে আরও হালকা হয়ে উঠতে লাগলো উষ্ণ সূর্যাস্তের পটভূমিকায়। চারদিকে সমুদ্রের ঢেউ ফুলে-ফেঁপে উঠে দ্বীপের বিন্দুটাকে আড়াল করে ফেললো আমার দৃষ্টির দিগন্ত থেকে। দিনের আলো, সূর্যের শেষ আভাটুকু আকাশের বুক থেকে মিলিয়ে যেতে যেতে যেন একটা উজ্জ্বল পর্দার মতো এক পাশে গুটিয়ে গেলো। সূর্যের দীপ্তিতে লুকিয়ে থাকা অনন্ত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম, সেখানে অসংখ্য নক্ষত্রের মেলা বসেছে। সমুদ্র নিস্তব্ধ, আকাশ নিশ্চুপ। রাত্রি আর নিস্তব্ধতার সঙ্গে একা শুধু আমি।

এইভাবে তিনদিন আমি ভেসে গেলাম। এই তিনদিনে আমি খাওয়াদাওয়া করেছি সামান্যই, শুধু ভেবেছি অতীতের ঘটনাগুলোর কথা—আবার মানুষ দেখতে পাবার তেমন কোনো দারুণ উৎসাহও অনুভব করিনি তখন। আমার পরনে একটা অতি নোংরা পোশাক, মাথায় কালো চুলের জট। ওই অবস্থায় যারা আমাকে আবিষ্কার করেছিলো, তারা নিঃসন্দেহে আমাকে পাগল বলেই ধরে নিয়েছিলো। অদ্ভুত বলে মনে হলেও, তখন মানুষের সমাজে ফিরে যাবার মতো কোনো বাসনাই আমার মধ্যে ছিলো না। পশু-মানুষদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েই আমি তখন খুশি। সমুদ্রে ভাসার তৃতীয় দিনে অ্যাপিয়া থেকে স্যান ফ্রানসিসকোগামী একটা জাহাজে আমাকে তুলে নেওয়া হয়। জাহাজের ক্যাপটেন বা মেট কেউই আমার কথা বিশ্বাস করেনি। তারা ধরেই নিয়েছিলো, নির্জনতা এবং বিভিন্ন বিপদে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। পাছে অন্যেরাও তাই মনে করে, সেই আশঙ্কায় আমার এই রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী আমি আর কাউকে বলিনি। শুধু বলেছি, লেডি ভেইন ডুবে যাবার পর থেকে জাহাজে ফের আমাকে তুলে নেওয়া অব্দি সময়টাতে—যার ব্যাপ্তি একটা বছর—কি হয়েছিলো তার কিছুই আমার মনে নেই।

পাছে লোকে আমাকে পাগল বলে মনে করে, সেই ভয়ে আমাকে সর্বদা সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হতো। পশু-মানুষদের আইন, দুজন মৃত নাবিক, অন্ধকারে ওত পেতে থাকা জীব আর বেত-ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা সেই দেহটার স্মৃতি আমাকে যেন তাড়া করে বেড়াতো। অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও, মানুষের সমাজে ফিরে এসে আমার প্রত্যাশামতো আস্থা আর সহানুভূতি পাবার বদলে দ্বীপে থাকাকালীন অনিশ্চয়তার অনুভূতিটাই যেন আমার মনে আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে উঠলো। কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। পশু-মানুষরা আমাকে একটা বিচিত্র প্রাণী বলে মনে করতো, স্বাভাবিক মানুষও আমাকে প্রায় তা-ই মনে করে। কে জানে, আমার সঙ্গী পশু-মানুষদের স্বভাবগত বন্যতার খানিকটা হয়তো আমার চরিত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে!

সবাই বলে, আতঙ্ক একটা ব্যাধি। আজ বেশ কয়েক বছর হলো একটা অশান্ত আতঙ্ক আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। একটা আধ-পোষা সিংহ-শিশু হয়তো

ঠিক এই ধরনের আতঙ্কই অনুভব করে। কিন্তু আমার সমস্যাটা একেবারে বিচিত্র ধরনের। আমি কিছুতেই নিজেকে বুঝিয়ে উঠতে পারি না, যে সমস্ত নারী-পুরুষকে আমি দেখতে পাই তারা সবাই স্বাভাবিক মানুষ। কেবলই মনে হয় এরাও সেই পশু-মানুষ, এদেরও বাইরের চেহারাটাকে চেঁছেছুলে মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে এবং কিছুদিন বাদেই এদের ভেতরে পশুত্বের লক্ষণগুলো ফের ফুটে বেরুতে শুরু করবে।

একটিমাত্র মানুষকে আমি বিশ্বাস করে পুরো ঘটনাটা খুলে বলেছি। তিনি একজন মনস্তত্ত্ববিদ, মোরোকে তিনি চিনতেন। মনে হয় তিনি আমার কথা কিছুটা বিশ্বাস করেছেন এবং আমাকে তিনি সাহায্যও করেছেন অনেক।

দ্বীপের সেই আতঙ্ক আমার মন থেকে চিরদিনের মতো মুছে যাবে, এ আশা আমি কখনই করি না। অধিকাংশ সময় তা আমার মনের শেষ প্রান্তে পড়ে থাকে সুদূরের এক টুকরো ছোট্ট মেঘের মতো—শুধু একটা স্মৃতি, এক টুকরো ক্ষীণ অবিশ্বাস। কিন্তু কখনও কখনও সেই ছোট্ট মেঘটা ছড়িয়ে গিয়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে। তখন চারদিকের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। আমি দেখতে পাই কিছু কিছু মুখ তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত—কেউ কেউ নির্বোধ বা ভয়ঙ্কর—আর অন্যেরা দ্বিধাগ্রস্ত কিংবা কপট। আমার মনে হয়, ওদের মধ্যে ক্রমশ পশুপ্রবৃত্তি জেগে উঠছে···দ্বীপবাসীদের যে অধঃপতন হয়েছিলো, শীগগিরি ফের তার প্রকাশ ঘটবে এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে। আমি জানি, আমার এ ধারণাটা সম্পূর্ণ অলীক। আপাতদৃষ্টিতে যাদের দেখে পুরুষ বা নারী বলে মনে হচ্ছে তারা সবাই সত্যিকারের মানুষ, চিরদিন এরা মানুষই থাকবে। মানুষের বিচার-বুদ্ধি, কামনা-বাসনা, কোমল অনুভূতি—সমস্ত কিছুই এদের আছে। এরা কোনো অদ্ভুত আইনের গোলাম নয়, পশু-মানুষদের থেকে এরা সম্পূর্ণ আলাদা। তবু ওদের দেখে আমি কুঁকড়ে উঠি—ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি, ওদের অনুসন্ধিৎসা আর সহায়তার নাগাল থেকে আমার একা একা দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

এই কারণেই আমি আজকাল শহর থেকে দূরে খোলা জায়গায় বাস করি। মনে মেঘের ছায়া জমলে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি—বাতাস-বয়ে-যাওয়া খোলা আকাশের নিচে এই নির্জন অঞ্চলটাকে আমার ভারি ভালো লাগে তখন। লণ্ডনে আমি কিছুতেই মানুষের সঙ্গ এড়াতে পারতাম না। জানলা দিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতো, তালা-বন্ধ দরজাকেও মনে হতো ভঙ্গুর এক প্রতিবন্ধক। সেখানে মনের ভ্রান্তি কাটাতে রাস্তায় বেরুলে চতুর্দিক থেকে কপট মানুষের দল ঈর্ষাপীড়িত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়, স্বাস্থ্যহীন ক্লান্ত শ্রমিকরা কাশতে কাশতে আমার পাশ দিয়ে চলে যায়—রক্ত-ঝরা আহত হরিণের মতো ক্লান্ত তাদের দৃষ্টি, ব্যগ্র তাদের পদক্ষেপ। সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া বিষণ্ণ বৃদ্ধের দল নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করতে করতে পথ চলে। কলকল করতে করতে চলে যায় শিশুর দল। ওদের পাশ কাটিয়ে কোনো গির্জায় ঢুকলে পাদ্রীর উপদেশ শুনে মনে হয়, বানর-মানুষের মতো

উনিও বকবক করে 'বড়ো চিন্তা' শোনাচ্ছেন। এমন কি পাঠাগারে গিয়ে একমনে বইয়ের ওপরে ঝুঁকে থাকা মুখগুলোকে দেখে মনে হয়, ধৈর্যশীল প্রাণীরা যেন শিকারের অপেক্ষায় ওত পেতে রয়েছে। বিশেষ করে ট্রেন আর বাসযাত্রীদের অভিব্যক্তিহীন মুখগুলো দেখে আমার গা গুলিয়ে ওঠে···মনে হয় ওরা আমার মতো জীবন্ত নয়, ওরা সবাই মৃত—তাই একা না থাকলে আমি ট্রেনে বা বাসে চাপি না। এমনও মনে হয়, আমি আর স্বাভাবিক মানুষ নই—মস্তিষ্কের এক বিচিত্র বিকৃতির জন্যেই আমি একা একা ঘুরে বেড়াই।

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ ধরনের মানসিক অবস্থা আজকাল আমার খুব কমই হয়। শহরের বিভ্রান্তি আর কোলাহল থেকে আমি এখন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমার চারদিকে অসংখ্য জ্ঞানের বই। আমার ছোট্ট একটা সংসার, অপরিচিত মানুষের সঙ্গে আমি দেখাসাক্ষাৎ করি না বললেই চলে। পড়াশুনো আর রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় আমার দিন কাটে আর অনেক নির্মেঘ রাতই কেটে যায় জ্যোতির্বিদ্যার চর্চায়। কেন জানি না, অসীম আকাশের কোলে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকা ওই নক্ষত্রগুলোর মাঝে আমি এক সীমাহীন শান্তি আর নিরাপত্তাবোধ অনুভব করি। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তির উর্ধ্বে যা কিছু আছে তা—মানুষের দৈনন্দিন উদ্বেগ, অপরাধ আর সমস্যার মধ্যে নয়—প্রকৃতির বিশাল এবং অন্তহীন নিয়মের মধ্যে অবশ্যই শান্তি আর আশার সন্ধান পাবে। আমিও আশা নিয়েই বেঁচে আছি, নয়তো বাঁচতাম না। তাই আশা আর নিঃসঙ্গতা নিয়েই শেষ হোক আমার কাহিনী।

—এডওয়ার্ড প্রেনডিক

—